: প্রথম প্রকাশ :

আশ্বিন : ১৩৬২

মূল্য দুই টাকা

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :

বিজয় কুমার চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন :

মোহন প্রেস

ব্লক করেছেন :

সিটি আর্ট প্রোডাক্‌সন্স

প্রকাশ করেছেন :

সুশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬/এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

ছেপেছেন :

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ঘোষ আর্ট প্রেস

১৩৫/এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৭

অনুসরণ

এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক।

ইভা মন স্থির করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

রায়বাহাদুরের শয়ন কক্ষের দরজা ভেজানো। ইভা ইতস্ততঃ করে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল।

তখন রাত ন'টা। রায়বাহাদুর সনাতন সরখেল যেন কোন গোপন কাজে ছিলেন; ইভাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি কাগজ পত্র ডেস্কে বন্ধ করে বললেন,—তুমি এখনও বাড়ী যাওনি?

—না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ইভা।

—আমাকে কিছু বলবে? বস।

ইভা বসল না। বলল,—আজ আপনার সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করব।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে রায়বাহাদুর বললেন,—শেষ বোঝাপড়া!

—হ্যাঁ। আমি আজ শেষবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন কি না? আমার অসহায়তার সুযোগ আপনি পুরোমাত্রায় নিয়েছেন, আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার সম্ভ্রম বাঁচান।

—তুমি বড় অবুঝ ইভা। কদিন থেকেই এই বিয়ের কথাটা কেন যে তোমার মাথায় ঢুকেছে বুঝতে পারছি না তুমি তো বোঝ, এই বয়সে বিয়ে করে আমি হাস্যাস্পদ হতে পারিনে। কিন্তু বিয়ের কারণকে অতিক্রম করা যখন

তোমার বা আমার কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি, সেক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ কর।

—তা হয় না।

—কেন হয় না? সংস্কার, দ্বিধা—সে তো দুর্বলতা। এগুলোকে প্রশ্রয় দিলে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে এরা তোমার চলার পথ একেবারে রুদ্ধ করে দেবে।

—আপনার ঐ কথার যাদুতে ভুলিয়েই আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। মোহ আমার কেটে গেছে। মন আমার গ্লানিতে ভরে উঠেছে। বাবার বয়সি আপনি, কিন্তু আমায় প্রলুব্ধ করে—

ইভার কথা শেষ করতে না দিয়েই রায়বাহাদুর বলে উঠলেন,—মেয়েদের সেই একঘেয়ে পচা, পুরানো বুলি। 'মোহ কেটে গেছে, গ্লানিতে মন ভরে উঠেছে'—তোমার এই কথাগুলোর একটাও সত্যি নয়। তোমার তনুতন্ত্রের প্রতিটি স্পন্দনের অনুভূতির অভিজ্ঞতায় আমি বলছি,—তুমি মিথ্যে বলছ। আর শোন ইভা, প্রলুব্ধ তোমায় আমি করিনি, প্রলুব্ধ হয়েছি। যাক্—সে তর্ক আপাততঃ অবান্তর। তুমি বলছিলে বিয়ে করে তোমার সম্ভ্রম বাঁচাতে, কিন্তু সম্ভ্রম তোমার কিসে নষ্ট হল—তা তো বুঝতে পারছি না। তোমার আমার মাঝে যে সম্বন্ধই গড়ে উঠুক বাইরের দৃষ্টিতে তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। এতে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকুও; কিন্তু—অসম-বয়সে তোমার আমার বিবাহ

শুধু হাস্যোদ্দীপক নয়, মর্যাদা হানিকরও বটে। প্রাইভেট সেক্রেটারী ছাড়াও, তোমার আরেকটা পরিচয়,—তুমি আমার বন্ধুকন্যা। আশা করি, এবার তুমি বুঝবে।

—বন্ধুকন্যার সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করতে তো আপনার বাধেনি? লোকে যা ভাবে ভাবুক, বিয়ে না করে সত্যিই এখন আর আমার উপায় নেই। যত দিন যাবে, আমার দেহের পরিবর্তন লোকের চোখে ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

—তবে কি, তুমি—

—হ্যাঁ।

ইভা মাথা নীচু করল।

রায়বাহাদুর প্রথমটা কোন কথা বলতে পারলেন না। তিনি এ সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

অবশ্য বিয়ে ছাড়া অন্য অনেক সহজ উপায়ে অন্তর্বত্নী কুমারীর বিপন্মুক্ত করতে তিনি সক্ষম, কিন্তু ইভা কি রাজী হবে! রাজী না হলে, তার কথামত তাকে তো বিয়ে করা চলতে পারে না!

রায় বাহাদুর সঙ্কল্প স্থির করে ইভার কাছে সরে এলেন। ইভার পিঠে একখানি হাত রেখে মিষ্টি করে ডাকলেন,—ইভা, এই কারণে বিয়ের জন্য এত উতলা হয়েছ? কোন

চিন্তা কর না,—আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না, জানতেও পারবে না।

যেন একটা মস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন—এমনি নিশ্চিন্ত কণ্ঠে রায়বাহাদুর চাকরকে উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, —ওরে গোবিন্দ !

গোবিন্দ প্রবেশ করতেই বললেন,—দিদিমণি এখানেই খেয়ে যাবেন। আমাদের খেতে দিতে বল্ ঠাকুরকে। তুমি এখানেই খেয়ে যাও ইভা, রাত হয়েছে।

গোবিন্দ চলে যেতেই ইভা বলল্, আমি জানি, আপনি কি ব্যবস্থা করতে চাইছেন, কিন্তু আমি তা পারব না। হয় আমায় বিয়ে করুন, না হয়ত আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।

—তুমি বড় বেশী উত্তেজিত হয়েছ, ইভা। স্থির ভাবে ভেবে দেখ, তিন বছর আগেকার কথা। তোমার দাদা তোমায় একা নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। তখন তুমি সংসার অনভিজ্ঞা অষ্টাদশী যুবতী। তোমার নিরাপত্তা বা সংস্থান কোন কিছুই তোমার দাদা করে যায়নি।

দাদার নামে দোষারোপ করতেই ইভা জ্বলে উঠল। বলল,—দাদা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন,—একথা আপনি না জানেন, তা নয়। এত অতর্কিতে তাঁর চলে যাবার প্রয়োজন

ঘটেছিল যে, যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগও তিনি পাননি। দাদা জানতেন, আমি তাঁরই বোন। বিপদে একেবারে ভেঙ্গে পড়ব না, এ ভরসা তাঁর ছিল। আপনি তখন না এসে দাঁড়ালেও ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হয়ে যেত।

—তা হত, আমি অস্বীকার করি না। তোমার মত রূপবতী কুমারীর প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তির অভাব হত না নিশ্চয়ই—আর তার অর্থও তুমি না বোঝ তা নয়।

—সবাইকে নিজের মত মনে করেন কেন?

—কেন না, আমার তোমার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে, সেইটাই স্বাভাবিক ঘটনা। আমার ক্ষেত্রেও যে ব্যতিক্রম না হতে পারত—তা নয়,—তবে তা হয়নি। ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই তার পরিণতি লাভ করেছে। হ্যাঁ, তবে আরেকটা ব্যবস্থা যা হতে পারত—সে হচ্ছে, তোমার পিতৃ-পরিত্যক্ত দেশের বাড়ীতে গিয়ে বাস করা। সেখানকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। অধুনা পাকিস্তান, পাবনা জেলার এক অজ-পাড়া-গাঁ। তোমার বাবা সেখানকার কোন আকর্ষণই কোনদিন অনুভব করেননি। নিতান্ত শিশুকালে তুমি সেখানে দু' একবার গেলেও, তোমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। তোমার পিতৃকুলের রক্ত বহন করে, অতীতের সাক্ষ্য জীর্ণ স্মৃতি-স্তম্ভের মত আজও যারা সেখানে বিরাজ করছে,—তাদের কাছে তোমার মত দুঃস্থা, বিবাহ-যোগ্যা আত্মীয়

কন্যার আবির্ভাব হত অনভিপ্রেত। সে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তুমি সেখানে বাস করতে পারতে না।

একটু থেমে রায়বাহাদুর বলে চললেন,—আজ তুমি আমায় দোষারোপ করছ,—কিন্তু সসম্ভ্রমে নিজের পায়ে দাঁড়াবার যথেষ্ট সুযোগ কি আমি তোমায় দিইনি? তোমার দাদার অন্তর্ধানের পর পুলিশের জুলুম থেকে তোমাকে সরিয়ে এনে তোমাকে শুধু আশ্রয়ই দিই নি, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবার উপযুক্ত অর্থও তোমাকে দিয়েছি। শুধু কর্তব্য প্রণোদিত হয়েই সেদিন আমি অগ্রসর হয়েছিলাম। তোমার প্রতি কোন আকর্ষণই সেদিন অনুভব করিনি। তুমি সুন্দরী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা। তোমার প্রতিদিনকার সাহচর্যে জেগে উঠতে লাগল, নারীর প্রতি আমার স্বাভাবিক দৌর্বল্য। বিয়ে আমি করিনি,—কিন্তু ভীষ্মদেব আমি নই। উপযুক্ত সময়ে বিয়ে করবার সুযোগ আমার ঘটে নি; তাই আমি অকৃতদার। নারীর প্রয়োজন আমি কোনদিনই অস্বীকার করি নি। অনুষঙ্গ-প্রভাবে তোমার নিরুদ্ধ কামনার বাঁধও গেল আলগা হয়ে। বাঁধ আলগা হয়ে স্রোত এল দুর্বার। গঙ্গার প্লাবনে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল; ঐরাবতের বিরাট দেহে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ল ঢেউ। ঐরাবত ডুবে গেল, ভেসে উঠল—আবার ডুবল। আদি গঙ্গায় এখন পড়েছে চড়া। সে চড়া, কালের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু তুমি! তোমার যৌবনের উচ্ছলতা তো উচ্ছ্বসিত হয়ে যায়নি? তবে কেন

তোমার এই আত্মহত্যার প্রয়াস ? দোষ আমারও নয়, তোমারও নয়। স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক আকর্ষণের পরিণতির প্রতিক্রিয়ার নিরসন করতে চাইছ তুমি বিয়ের আবরণ টেনে,—বিংশ শতাব্দীতে তোমার এই যুক্তি নিতান্ত বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনের সামান্য একটা ঘটনাকে এত বড় করে দেখছ কেন ? এই সামান্য ঘটনার দায় এড়াতে, বিয়ের দড়ি, গলায় এঁটে, তোমার সমস্ত জীবন বিড়ম্বিত করায় কি লাভ আছে ? একটা কথা বলি, আমাকে বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে তোমার কোনো ভালবাসার প্রশ্ন নেই,—শুধু একটা দায় এড়ানোর অজুহাত। একটা স্থবির সংস্কারের মোহ তোমায় আচ্ছন্ন করে আছে। স্বীয় মর্যাদায় তুমি আজও প্রতিষ্ঠিত, সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দাও, দেখবে—চলার পথ তোমার কত সহজ হয়ে গিয়েছে। দেহে ও মনে যুবক হ'লেও, বাঙ্গালীর হিসেবে বয়স আমার বৃদ্ধত্বের কোঠায়। সংসারকে চিনেছি আমি, আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, ভালো-মন্দের মাপকাঠি আমার কাছে সম্পূর্ণ আলাদা। নারীর রূপ-যৌবন সুস্থ সবল পুরুষকে প্রলুব্ধ করবেই—আর এইটাই স্বাভাবিক। নারীর পক্ষেও পুরুষের আকর্ষণে কোন ব্যতিক্রম নেই। ঠিক একই নিয়মে তোমার আমার সম্বন্ধ নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন উভয়তঃ হলেও, আমি তোমায় ঠকাইনি। অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিষ্ঠা সবই তুমি পেয়েছ।

—প্রকারান্তরে আমি আপনার রক্ষিতা—তাই নয় কি ?

—না, তুমি ভুল করছ। তোমার পরিচয়, তুমি একজন বিশিষ্ট নাগরিক তথা খ্যাতিমান ব্যবসায়ীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। ইভা, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, হ্যাঁ একটু বেশীই ভাল লেগেছে—তাই আমি চাই, তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও।

—আপনার কথার প্রতিবাদ আমি করছি না। কিন্তু আমার প্রতি ধমনীর রক্তস্রোতে মিশে রয়েছে ভীরু স্থৈর্যতা শত প্রলোভনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি,—কিন্তু আপনার গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার সাহসও আমার নেই।

আবার বলল,—মেয়েতে আপনার মত হবে না, আমি জানতাম। আপনার প্রস্তাবে সায় দিতেও আমি পারছি না। আপনি আমায় হাজার ত্রিশেক টাকা দিন, নিজের দায়িত্বে পথ আমি বেছে নেব।

রায় বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বললেন,—না বললেও অনুমান করতে পারছি, কি তোমার পথ। তোমার ভাবী সন্তানের কাছে সুদূর ভবিষ্যতেও আমার কোন নামোল্লেখ হবে না, কথা দিতে পার ?

—বেশ তাই হবে।

ইভার কথা শেষ হতে না হতেই গোবিন্দ এসে জানাল, খাবার দেওয়া হয়েছে।

রায়বাহাদুর বললেন,—খেতে চল ইভা।

কথার পর রায়বাহাদুরের সঙ্গে বসে খাবার মত মনের অবস্থার ছিল না। রায়বাহাদুরের আমন্ত্রণে সে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

রায়বাহাদুর তার দ্বিধা বুঝতে পেরে বললেন,—হয়ত আর কোনদিন আমাদের একসঙ্গে বসে খাওয়ার সুযোগ ঘটবে না। অন্ততঃ শেষ বিদায়ক্ষণে মনে কোন গ্লানি রেখনা।

বাক্‌পটু রায়বাহাদুরের কথার ধরণে ইভা কোন কিছুই না বলে, তাঁর অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়ার পর ইভা ও রায়বাহাদুর পুনরায় ঘরে এসে ঢুকলেন।

রায়বাহাদুর ইভাকে বললেন,—বস।

ইভা চেয়ারে বসল।

রায়বাহাদুর চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন,—চেক দেওয়াতে অসুবিধা আছে, টাকাটা আমি তোমাকে নগদই দেব।

—তাতে আমারও সুবিধা। ইভা বলল।

আয়রণ সেফ খুলে তিন বাণ্ডিল নোট এনে ইভার সামনে রেখে বললেন,—গুণে নাও। দশ হাজার করে প্রতি বাণ্ডিলে আছে।

ইভা নোটগুলো গুণে তার এ্যাটাচিতে রেখে উঠে দাঁড়াল।

রায়বাহাদুর ইভার দিকেই এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। ইভা তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন,—যাচ্ছ ?

ইভা একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ।

রায়বাহাদুরের এ দৃষ্টির অর্থ ইভা জানে।..... ...

দুই -

কলকাতার রাত্রির গভীরতা স্বচ্ছ ; জমাট বাঁধতে পারে না যেন।

দু'পাশের দোকানগুলো থেকে রাস্তার ওপর বিচ্ছুরিত বিজলী-বাতির রোশনাই আর নেই। রাত বারোটার পর রাস্তার একধারে দূরে দূরে গ্যাসের আলো আব্ছা অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে।

পানের দোকান দু' একটা তখনও খোলা রয়েছে। আব্ছা অন্ধকারে পানের দোকানের আলোটা বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে,— রাস্তার ওপরেও সে আলোর এক ফালি এসে পড়েছে।

ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। পীচের রাস্তায় টায়ারের দ্রুত-চাপা আলোড়ন তুলে দু'একখানা মোটর গাড়ী মাঝে মাঝে ছুটে চলেছে।

রসা রোড ধরে ইভার গাড়ী চৌরঙ্গীর দিকে আসছে। রায়বাহাদুরের গাড়ীতেই ইভা গৃহে ফিরছে। রায়বাহাদুরের বাড়ী প্রতাপাদিত্য রোডে আর ইভার বাসস্থান সুকিয়া রো'তে।

ইভার গাড়ী চৌরঙ্গীতে এসে গেল।

দৃষ্টি মেলে ইভা দেখল চৌরঙ্গীকে। বিলাসিনী চৌরঙ্গী।

গভীর রাত্রিতে বিলাসিনী চৌরঙ্গীর ঝলকানো রূপ যেন অবসাদে ম্লান। সারাদিনের মুখরতা নিথর।

রাত করে বাড়ী ফেরা ইভার কাছে আজ নূতন নয়। কলকাতার মাঝ-রাত্তিরের ঝিমিয়ে পড়া অবসাদ-মাদকতার মধ্যে ইভা নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। রায়বাহাদুরের 'প্যাকার্ডের' কৌচের মসৃণতায় গা এলিয়ে দিয়ে ইভা কলকাতার মাঝ-রাত্তিরের অবসাদ-মাদকতার আস্বাদ গ্রহণ করে তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। আজ মন তার বড় হাল্কা। সমস্ত চিন্তা ভাবনা শুধু এই রাতটুকুর জন্যে সে ভুলে থাকতে চায়।

কোলের ওপর এ্যাটাচির মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকার কড়কড়ে নোটের তাড়া;—এ্যাটাচির ওপর অনাবশ্যকভাবে হাত বুলিয়ে নিল ইভা। রায়বাহাদুরের কাছে টাকাটা সে এভাবে আদায় করতে পেরেছে—এতে ইভা স্বীয় অভিনয় দক্ষতায় নিজেই বিস্মিত হল।

রায়বাহাদুরের কথা মনে হতেই ইভার মুখে ফুটে উঠল অবজ্ঞাভরা সহানুভূতি। ইভার এ অবজ্ঞা রায়বাহাদুরের বয়সের জন্য নয়; কারণ বয়স হলেও তিনি আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিক! প্রথমে বৃদ্ধের লালসা-লোলুপ আহ্বানে ইভার মন বিষিয়ে উঠেছিল ঘৃণায়, কিন্তু পরক্ষণেই তা পরিবর্ত্তিত হয়েছিল আকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তি প্রেরণায়।

প্লাবনের প্রথম উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলে, নানা প্রশ্ন এসে ভীড় করল ইভার মনে। না-জানা না-পাওয়া জিনিষের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় রায়বাহাদুরের চারিত্রিক দুর্বলতার প্রলোভনে ইভা মুহূর্তের দুর্বলতায় ধরা দিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তাই বলে সুস্থ সমাজ-জীবন থেকে সে বঞ্চিত হবে কেন? ইভা জানে, রায়বাহাদুরের কাছে তার প্রয়োজনও যাবে ফুরিয়ে,—তার যৌবনের ভাটার সঙ্গে সঙ্গে। মানব-মনের প্রকৃতিই এই। ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য ইভা চায় বিবাহ-বন্ধন।

রায়বাহাদুরের দুর্বলতা ইভা জানত,—বিয়ে করতে রাজী হবেন না তিনি কিছুতেই। তাই তাঁর দুর্বলতার সুযোগে এতগুলো টাকা ইভা আদায় করতে পেরেছে।

টাকার প্রয়োজন ছিল ইভার।

তার রূপ আছে, যৌবন আছে,—টাকাও সে কিছু অর্জন করে নিয়েছে; এবার ভবিষ্যত সম্বন্ধে ইভা নিশ্চিন্ত হল অনেকখানি।

ইভার গাড়ী তার বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল।

ইভা গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে দরজা-সংলগ্ন কলিং বেল টিপে ধরল।

ঝি পড়েছিল ঘুমিয়ে; কিন্তু খামখেয়ালী ইভার অধীনে

চাকরী করতে করতে তার ঘুমও অভ্যাসবশে সজাগ হয়েছে।

বেলের শব্দ শুনেই ঝিয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে—উঠে দরজা খুলে দিল।

ইভা ঘরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল,—আমি খাবনা মানদা, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়।

ইভা তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল !

তিন—

পরদিন ঝি ইভার জন্য চা করে নিয়ে এসে দেখল,—তার দরজা এখনও বন্ধ।

চা নিয়ে সে ফিরে গেল।

ক্রমে বেলা হ'ল অনেক, ইভা তবুও দরজা খুলল না। ঝি শেষে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল। ইভার দিক থেকে কোনই সাড়া পাওয়া গেল না!

ডাক্তার জয়ন্ত বোসের ডিস্‌পেনসারি ইভার বাসার ঠিক উল্টো ফুটে—। পাড়ায় আর কারো সঙ্গে ইভার—তেমন কোন মেলামেশা ছিল না, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে, ডাক্তার জয়ন্ত বোসের এ বাড়ীতে যথেষ্ট আনাগোনা ছিল।

ইভা কোনদিনই তার ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমত না। কিন্তু কাল কেনই বা দরজা বন্ধ করল, আর এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েই বা আছে কেন—ঝিয়ের মনে খট্‌কা লাগল।

ঝি মানদা সোজা ডাক্তার বোসের ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়ে বলল,— ডাক্তারবাবু— দিদিমণি দরজা খুলছে না।

ডাক্তার বোস জিজ্ঞাসুনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বলল, — দরজা খুলছে না, মানে?

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু,—কাল রেতে—দিদিমণি দরজা বন্ধ করে শুয়েছে, আর আজ—এত বেলা হ'ল ডেকে ডেকেও তার

কোন সাড়া পাচ্ছি না ; দরজা ভেতর থেকে বন্ধ

—আচ্ছা চল, দেখছি।

ইভার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

ডাক্তার বোস জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল ভেতর থেকে কোনই সাড়া এল না।

—ইভাদেবী, দরজা খুলুন।

ডাক্তার বোস চেঁচিয়ে বলল।

কিন্তু দরজা খুলল না বা ভেতর থেকে ইভার কোন উত্তরও পাওয়া গেল না।

ডাক্তার বোস একটু চিন্তা করল। তারপর ঝিকে বলল —তুমি বাড়ী থেকে কোথাও যেও না, আমি এক্ষুণি আসছি।

ডাক্তার বোস তার চেম্বারে ফিরে এসে টেলিফোন তুলে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানার নম্বর চাইল।

—হ্যালো।

—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পুলিস ষ্টেশন ?

—হ্যাঁ।

—ও-সি-র সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বলুন, আমি ও-সি।

—আমি ডাক্তার জয়ন্ত বোস, ৩নং সুকিয়া রো থেকে কথা বলছি। ৭নং সুকিয়া রো, মানে—আমার চেম্বারের ঠিক উল্টো দিকে মিস ইভা চৌধুরীর বাসা। মিস্ চৌধুরীর ঝি এসে একটু আগে আমাকে জানাল যে,—কাল রাত্রে মিস্ চৌধুরী দরজা বন্ধ করে—শুয়েছেন, আর আজ এত বেলা পর্যন্তও ডাকাডাকি সত্ত্বেও ওঁর দরজা খুলছে না। আমি নিজে গিয়েছিলাম, ঝির সঙ্গে। আমি ওঁদের পারিবারিক ডাক্তার—। অনেক চেষ্টা করেও ভেতর থেকে ওঁর কোন সাড়া পেলাম না। ব্যাপারটা একটু অদ্ভূত মনে হচ্ছে।

—তাঁর বাড়ীতে আর কে কে আছে ?

—শুধু—একমাত্র ঝি ছাড়া আর কেউ থাকে না।

—ও, আচ্ছা—আমি এক্ষুনি আসছি। ঝিটাকে কোথাও যেতে দেবেন না।

—আচ্ছা, ধন্যবাদ।

ডাক্তার বোস ফোন ছেড়ে দিল।

বাতাসের আগায় চলে কথা।

ইভার এই দরজার না খোলার ব্যাপারটা—এর মধ্যেই অনেকের কাছে পৌঁছে গেছে। বৃদ্ধ রামতারণবাবু

ডাক্তার বোসের চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,—কি হে ডাক্তার, এ সব কি ব্যাপার, বল ত ? তুমি তো গিয়েছিলে সেখানে শুনলাম,—তা কি দেখলে ?

—ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই মনে হচ্ছে, এইমাত্র থানায় ফোন করলাম,—ওরা আসছে।

—বলি, ফাঁস-টাস নেয়নি তো ?

—কি করে বলব, দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ।

—ওসব মেয়ে ভাল নয়, তোমাকে পই পই করে বলেছিলাম, ডাক্তার, ওসব নেশায় মেত না। তুমি ডাক্তার, ওসব মেয়ের সঙ্গে তোমার মেশা কি ভাল ? পাড়ার আর পাঁচজন তোমাকে খারাপ ভাবতে পারে !

—আজ্ঞে, ডাক্তার বলেই তো রুগী ডাকলে, না গিয়ে পারি নে। রুগী কেমন লোক, সে তো আমার বিচার করবার কথা নয়।

—হ্যাঁ ! রুগী তো ভারী !—বলি, সর্দি লাগল, মাথা ধরল, অমনি ডাক পড়ল তোমার। বুঝলে ডাক্তার, ওসব তোমার কাঁচা বয়সের নেশা,—ডাইনীর দৃষ্টি পড়েছে তোমার ওপর।

ডাক্তার জয়ন্ত বোস বৃদ্ধ রামতারণের কথায় একটু হাসল, উত্তর দিল না কিছু। রামতারণবাবুর ইভার ওপর রাগ ছিল ;—অবশ্য তার একটু ইতিহাস আছে।

ইভা একদিন গল্পে গল্পে ডাক্তার বোসকে বলেছিল সে কাহিনী।

ইভার দাদার হঠাৎ উধাও হওয়ার পর রামতারণবাবু ইভার ওপর একটু বেশী স্নেহপরবশ হয়ে পড়েছিলেন।

এ পাড়ায় দুখানা বাড়ীর মালিক রামতারণবাবু, স্বচ্ছল অবস্থা। তাঁর পাঁচটি সন্তানের জননীর মৃত্যুর পর রামতারণবাবু তাঁর সংসারধনের অবশিষ্টটুকু সম্পাদনার্থে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন। রামতারণবাবুর সংসারে আরও দুইটি সংখ্যা বাড়িয়ে সে স্ত্রীও গতায়ু হল। ভগবানের বুঝিবা এ পরিহাস!

রামতারণবাবুর সহধর্মিনীকে বার বার মরলোক থেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি রামতারণবাবুর ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করছেন,—অবশ্য রামতারণবাবুর তাইই মনে হয়। কিন্তু তিনি হার স্বীকার করবেন না কিছুতেই, তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করবার সঙ্কল্প করলেন।

দাদার অদৃশ্য হবার পর সদ্য অভিভাবকহীনা রূপসী ইভাকে সমবেদনা জানানোর অছিলায় তার সঙ্গসুখ আস্বাদনটুকুর লোভ ছিল পাড়ার যুবক-প্রৌঢ় অনেকেরই; তবে সেই একই অছিলায়, একবারের বেশী দুবার যাবার জোর পাওয়া যায় না। রামতারণবাবুর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

তিনি ইভার বাড়ীওয়ালা। ইভার বাড়ীতে তিনি ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলেন। বাহ্যতঃ বাড়ীভাড়া আদায়ের অছিলাটাই ছিল মুখ্য, কিন্তু রামতারণবাবুর মনের অলিগলিতে অন্য একটি বাসনা সঙ্গোপনে সঞ্চারিত হচ্ছিল।

ইভা যখন সত্য সত্যই একদিন তাঁকে বাড়ী ভাড়া দিতে গেল,—রামতারণবাবু বললেন,—ভাড়ার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি কি ভাড়ার জন্য তোমায় পীড়াপীড়ি করেছি, না তার জন্য রোজ আসি? সোমত্ত মেয়ে, মাথার ওপর কেউ নেই,—তাই দেখাশোনা করি। এতকাল আমার বাড়ীতে তোমরা বাস করছ,—তোমরা তো নিজের লোক বললেই হয়। থাক্, ভাড়ার টাকা এখন দিতে হবে না, আমি থাকতে তোমার কোন কিছু ভাবতে হবে না।

ইভা বলেছিল,—তা কি করে হয়, আপনার বাড়ীতে বাস করব, অথচ ভাড়া না দিয়ে? না তা হয় না, টাকাটা আপনি নিন,—পরে রসিদ পাঠিয়ে দেবেন।

—পরের কাছে চাকুরী করে বাড়ীভাড়া জোগাতে হবেনা তোমাকে। পরের বাড়ীতে বাস করছ—তাই বা মনে ভাবছ কেন? এটা তো তোমার নিজের বাড়ীও হতে পারে,—আমি না হয় লিখেই দেব। তোমার চাকরি করবার দরকারটা কি? চাকরি ছেড়ে দাও—। সোমত্ত মেয়ের চাকরি করা,—ওসব আমার ভাল মনে হয় না বাপু! তুমি যদি বল, কালই না হয়, তোমাকে এ বাড়ীর দলিলপত্র করে দিই?

ইভাকে ইঙ্গিত দিয়ে, তার উত্তর শোনবার অপেক্ষায় রামতারণবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে অনুচ্চ হাসি হাসতে লাগলেন।

রামতারণবাবুর কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে ইভার বেশ একটু দেরী লেগেছিল। কিন্তু বৃদ্ধের উদ্দেশ্য সে ব্যর্থ করে দিল—এটুকু বলে যে,—আপনি বাড়ী যান্—। আর কখনও এখানে আসবেন না। আপনার সরকার পাঠিয়ে দেবেন, রসিদ দিয়ে ভাড়া নিয়ে যাবে।

রামতারণবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন,—তুমি ঠিক বুঝতে পারনি। তোমাকে তোমার এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি,—তোমাকে জানি, চিনি। তোমার বাপ-ভাই চলে গেল,—কেউ নেই যে তোমার একটা স্থিতুভিতু করে দেয়। তাই বলছিলাম,—আমার স্ত্রী-হীন সংসারে লক্ষ্মীছাড়া বাসা বাঁধছে। তোমাকে ঘরের লক্ষ্মী করব, এইটাই আমার ইচ্ছা। তোমারও একটা হিল্লে হয়,—আমিও বেঁচে যাই। অবশ্য আমার বয়সটা তোমার আপত্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু হা-ঘরে, লক্ষ্মীছাড়া ছোড়াগুলো কি খেতে দিতে পারবে তোমায়—? আমার, বলতে নেই, যৎ-সামান্য যা আছে, তোমার কোনদিনই কোন অভাব হবে না, এ বাড়ীটাও না হয় তোমাকে লিখে দেব।

—আপনার ছেলে যা বলতে পারত,—আপনার মুখে তার উক্তি শোভা পায় না। তাই বলে, আপনি ভাববেন না যে, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার প্রেম ঘটেছে। তাকে আমি

দেখেছি,—দাদার সহকর্মী ছিল। দাদা থাকতে এ বাড়ীতে আসত মাঝে মাঝে। তার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। তাকে দেখেছি, তাই তার বয়সটা জানি। আচ্ছা, আপনি এবার আসুন।

ইভা আর অপেক্ষা না করে সেখান থেকে চলে গেল।

রামতারণবাবু অপমানিত হয়ে চলে এলেন। আর সেদিন থেকে ইভাকে না পাওয়ার হতাশার আক্রোশ মেটাতে লাগলেন, তার নামে কুৎসা গেয়ে। অন্য লোকে বিশ্বাসও করত, রামতারণবাবুর কথা। কেননা, কুৎসায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের নামে, বিশ্বাস না করাটাই আমাদের—স্বভাবে ব্যতিক্রম। রামতারণবাবু অবশ্য নিজের প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোন ইতর-বিশেষ হয় নি। পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুর সনাতন সরখেলের অধীনে চাকরি গ্রহণ, অধিক রাত্রিতে গৃহে ফেরা ইত্যাদি ঘটনা ইভার প্রতিবেশীরা খুব ভাল চোখে দেখে নি।

জীপ গাড়ী এসে দাঁড়াল ডিস্‌পেনসারির সামনে। চারজন কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে ও. সি. এসেছে।

ডাক্তার বোস ডিস্‌পেনসারি থেকে বেরিয়ে এল। রামতারণবাবুও সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

ইভার বাড়ীর মধ্যে তারা ঢুকল। রামতারণবাবু তাদের অনুসরণ করে ঢুকতে যেতেই কনেষ্টবল বাধা দিল তাঁকে।

—আরে বাবা, তুম জান্‌তা নেই—এ হামারা কোঠি হ্যায়।

রামতারণবাবুর হিন্দিবাত শুনে ডাক্তার বোস পুলিশ অফিসারকে বলল,—এ বাড়ীর উনিই মালিক।

—ও, আচ্ছা আসুন।

বাড়ীওয়ালা-আভিজাত্যে রামতারণবাবু এতক্ষণে যেন একটু স্ফীত হয়ে উঠলেন। কনেষ্টবলের দিকে বিজিত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে, উনি ভেতরে প্রবেশ করলেন।

ওপরে এসে ইভার বন্ধ-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সবাই। ঝি মানদা দোর গোড়াতে বসেছিল।

ঝিকে প্রশ্ন করল ও. সি.—তোমার দিদিমণি এখনও ওঠেন নি?

কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে মানদা উত্তর দিল,—না দারোগাবাবু।

তারপর চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মানদা। ও. সি. বলল,—তুমি কাঁদছ কেন?

ক্রন্দনজড়িত-স্বরে মানদা বলল,—আমার দিদিমণির কি হল গো দারোগাবাবু, দিদি আমার কত ভাল ছিল গো—কি সর্বনাশ হল গো!

মানদার বিলাপ উচ্চগ্রামে উঠল।

ও. সি. ধমক দিয়ে উঠল,—এই ঝি, চুপ কর।

ধমকের সঙ্গে সঙ্গে ঝিয়ের ক্রন্দনস্বর অতি নিম্নগ্রামে

নেমে এল। চোখে মুখে আঁচল-ঢেকে অস্পষ্ট স্বরে বিলাপ করতে লাগল মানদা।

—বলি, ও ভালমানুষের মেয়ে, কান্না থামাও—না হলে ধরে থানায়—নিয়ে যাব।

ও. সি'র এই কথাতে ভোজবাজীর মত মানদার কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল।

ও. সি. বন্ধ দরজায় আঘাত করে ডাকল,—মিস্ চোধুরী, উঠুন। আপনি দরজা না খুললে, দরজা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হব।

ভেতর থেকে কোন জবাব এল না।

অফিসার আবার বলল,—পাঁচ মিনিট সময় দিলাম,—এর মধ্যে আপনি দরজা না খুললে, দরজা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হব।

কোনই জবাব নেই।

অফিসার ঘড়ি ধরে পাঁচমিনিট অপেক্ষা করতে লাগল।

—এ ঘরে ঢোকবার আর কোন পথ নেই?

প্রশ্ন করল অফিসার।

অফিসারের প্রশ্নের উত্তর দিল রামতারণবাবু,—ছিল না বলেই তো জানি, তবে জল্লেশ বা তার বাবা যদি কিছু ভাঙ্গাচোরা করে থাকে, আমি জানি না। ওরা বহুদিন থেকে এ বাড়ীতে ভাড়া আছে কি না।

ঝিকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল,—এ ঘরে ঢোকবার আর

কোন পথ নেই। ঘরে যে জানালা আছে তাও বাগানের দিকে—অর্থাৎ বাড়ীর পেছনে সীমানা-প্রাচীরের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো জমি আছে, ইভার দাদা সেখানে ফুলের বাগান করেছিল। নীচের বাগান থেকে দোতালার জানালার শিক ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা যে কারোও পক্ষে দুঃসাধ্য।

অফিসার ঘড়ি দেখল, পাঁচ মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঝিকে প্রশ্ন করল অফিসার,—ঘরের ভেতরে খিল দেওয়া—না ছিটকিনি দেওয়া আছে ?

ঝি জবাব দিল,—দরজার মাথায় ছিটকিনি আছে।

—রাম সিং, কল লাগাও।

ও. সি'র হুকুমমত রার্মসিং কনেষ্টবল একটা ছোট যন্ত্র দরজার গায়ে লাগিয়ে তার হাতল ঘোরাতেই দরজার কাঠ গোল হয়ে কেটে যেতে লাগল। সেই ছিদ্রপথে রামসিং তার হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল। হাত টেনে বের করে, রামসিং দরজার পাশে সরে গেল। ও. সি. ও ডাক্তার বোস, রামতারণবাবু দরজার উভয় পার্শ্বে সরে গেল।

ও. সি. রিভলভার হস্তে প্রস্তুত হয়ে, রামসিংকে ইঙ্গিত করল। রামসিংয়ের সবুট পদাঘাতে ঘরের দরজা খুলে গেল।

ও. সি. ও রামসিং রিভলভার হস্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে ঘরে প্রবেশ করল।

ডাক্তার বোস ও রামতারণবাবু তাদের পদানুসরণ করল।

ঘরে কেউ কোথায়ও নেই। ইভা তখনও শয্যায় শায়িত। ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সবাই ইভার শয্যার দিকে অগ্রসর হ'ল।

ইভা তখনও গভীর নিদ্রামগ্ন। তার মুখ বেশ প্রশান্ত।

ডাক্তার বোস অফিসারকে বলল,—আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ডাক্তার বোস ইভার বাঁ হাত তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে, আস্তে হাতখানা শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—এঁর প্রাণ অনেকক্ষণ চলে গেছে।

ডাক্তারের মন্তব্য শুনে ও. সি. অবিশ্বাসের সুরে বলল,—মারা গেছেন! কই, দেখে তো মনে হচ্ছে না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, অফিসার। বাহ্যতঃ দেখে অনুমান করা শক্ত। এত স্বাভাবিকভাবে এঁর মৃত্যু ঘটেছে যে, চোখ-মুখের কোন বৈকল্যই হয়নি। মনে হচ্ছে, ঘুমের মধ্যেই ওঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

—অদ্ভুত ব্যাপার! আচ্ছা ডক্টর বোস, কতক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

—প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক আগে।

—এখন সকাল সাড়ে আটটা। হিসাব মত, রাত সাড়ে তিনটার সময় এঁর মৃত্যু ঘটেছে। আচ্ছা, মৃত্যুর কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন?

—এভাবে দেখে, কারণ নির্ণয় করা খুবই শক্ত। যতটা মনে হয়, This is a pure case of heart failure.

রামতারণবাবু বলে উঠলেন,—না ডাক্তার এর মধ্যে 'কিন্তু' আছে। আমি তো বরাবরই দেখছি, স্বাস্থ্য ইভার খুব ভালই ছিল। অসুখ-বিসুখ বড় একটা করে না। তা সর্দি, কাশি একটু আধটু সবারই হয়, তুমি তো তার ঘরের ডাক্তার, তুমিই বল না, স্বাস্থ্য ইভার খারাপ ছিল কি?

—আজ্ঞে না, স্বাস্থ্য ওঁর ভালই ছিল।

—তা হলে অসুখ বিসুখ নেই—দপ্ করে জলজ্যান্ত মানুষটা মারা গেল—এ কিরকম কথা!

অফিসার বললেন,—ঠিকই তো, আমরা খুব ভালভাবেই অনুসন্ধান করব—যদি কোন মৃত্যুরহস্য থাকে—তা নিশ্চয়ই প্রকাশ হয়ে পড়বে। রামসিং, লাস 'পোষ্টমর্টম্' মে যায়গা।

—জি হুজুর।

অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার বোস ও রামতারণবাবু বেরিয়ে এলেন। ঘরের বাইরে মানদা ও দুজন কনেষ্টবল অপেক্ষা করছিল। অফিসার মানদাকে জিজ্ঞাসা করল,—কাল রাতে বাইরের কোন লোক তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

—না দারোগাবাবু, দিদিমণির ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল।

—কোথায় গিয়েছিলেন উনি?

—মনিবের বাড়ী।

ডাক্তার বোস বললেন,—রায়বাহাদুর সনাতন সরখেলের উনি প্রাইভেট সেক্রেটারী।

—ও, তা তোমার দিদিমণির ফিরতে কাল অত রাত হল কেন, কিছু বলেছিলেন?

—না দারোগাবাবু।

রামতারণবাবু বলে উঠলেন,—বলবে আবার কি, এ তো নিত্যকার ব্যাপার। কি যে চাকরি, তা আমরা মুখ্যু মানুষ কি করে বুঝব মশাই! সোমত্ত মেয়ে মানুষ যে অতরাত পর্যন্ত পরপুরুষের কাছে কি চাকরি করে—তা ভগবানই জানেন।

অফিসার ঝিকে পুনরায় প্রশ্ন করল,—তোমার দিদিমণির বাড়ী ফিরতে কি রোজই রাত হত?

—মাঝে মাঝে দিদিমণির ফিরতে রাত হত।

—কাল কত রাতে ফিরেছিলেন? সঙ্গে আর কেউ ছিল?

—আজ্ঞে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,—কত রাত, তা বলতে পারব না। দিদিমণি এসে বেল টিপতে, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

—তার সঙ্গে আর কেউ ছিল কি?

পুনরায় প্রশ্ন করল অফিসার।

—সঙ্গে তো কেউ ছিল না দারোগাবাবু। দিদিমণি একলাই এল গো। আমাকে বলল,—রেতে কিছু খাবো না —তুই খেয়ে শুয়ে পড়।

—তুমি তো জান,—তোমার দিদিমণি কাল রাতে মারা গেছেন ?

—আমি কি করে জানবো,—ও বাবা গো, কি সর্বনাশ হল গো !

ঝি তারস্বরে চীৎকার করে উঠল।

—কাঁদাকাটি করোনা—আমার সঙ্গে তোমাকে থানায় যেতে হবে। যা জিজ্ঞেস্ করব,—ঠিক ঠিক যদি উত্তর দাও, তবে ছেড়ে দেব।

রামতারণবাবু ও ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল,—আপনাদের সাহায্য থেকেও আমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হব না—আশা করতে পারি !

ডাক্তার বোস বলল,—আমার দ্বারা আপনার যতটুকু কাজের সুবিধা হবে, তা আমি নিশ্চয়ই করব।

রামতারণবাবু বললেন,—আমি বুড়ো মানুষ, এসব খুনোখুনির মধ্যে আবার আমাকে কেন ?

অফিসার বলল,—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার যখন আপত্তি আছে, তখন এর মধ্যে নাই বা এলেন। খুন হয়েছে,—এটা আপনার মনে হল কি করে ?

রামতারণবাবু আম্‌তা আম্‌তা করে বলল,—আমার মনে কেন ? দেখছি তো অনেক, ও ধরণের পাখা ওঠা মেয়ের ওইই গতি হয়। বাপ মারা গেল মদ খেয়ে—ভাই হল দেশান্তরী—আর মেয়ে কি না বড়লোকের হাওয়া গাড়ীতে

করে রাত-বিরেতে বাড়ী ফিরতে লাগল। বলি, ও মেয়ের অপঘাত হবে না তো হবে কার ?

—তা আপনি ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা, আসুন ডাক্তার বোস—আপনিও একবার চলুন আমাদের সঙ্গে।

—চলুন। ডাক্তার বোস বলল।

ঝি মানদাকে নিয়ে একজন কনেষ্টবল, অফিসার ও ডাক্তার জয়ন্ত বোস জীপ গাড়ীতে গিয়ে বসল।

রামসিং আর দুজন কনেষ্টবল থেকে গেল। ইতিমধ্যে ফোন করে দেওয়া হয়েছিল, গাড়ী এসে গেলেই রামসিং, 'পোষ্টমর্টম' করতে নিয়ে যাবে।

চার—

থানায় গিয়ে অফিসার মানদাকে 'লক আপে—'রাখতে আদেশ দিল।

নিজের টেবিলে বসে, ড্রয়ার থেকে একটি সিগারেটের কৌটো বের করে ডাক্তার বোসকে এগিয়ে দিল, পুলিশ অফিসার।

নিজেও একটি সিগারেট ধরিয়ে বলল,—আচ্ছা ডাক্তার বোস, মিস্ ইভা চৌধুরীকে আপনি কতদিন থেকে জানতেন ?

—তা প্রায় বছর চারেক। জল্লেশবাবু তখন ছিলেন। জল্লেশবাবুর নাম বোধহয় আপনি জানেন ?

—নাম হয়ত শুনে থাকব,—ঠিক মনে করতে পারছিনা।

—জল্লেশবাবু ইভা দেবীর দাদা। 'বিপ্লবী ভৈরব' জল্লেশবাবুরই নাম।

—ওঃ তাই নাকি! 'বিপ্লবী-ভৈরবের' নাম কে না জানে বলুন। সারা জীবন তো চাঁটগা, বরিশাল—পাবনা, বগুড়া করেই কাটল। 'বিপ্লবী ভৈরবের' নাম আমি জানি,—কিন্তু তার কোন রেফারেন্স আমার জানা নেই। আচ্ছা আপনি বলুন, যা বলছিলেন।

ডাক্তার বোস বলল, তার মর্মার্থ সংক্ষেপে :

—জল্লেশবাবু '৪৫ সনের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন কোথায় যে চলে গেলেন,—কেউ তাঁর সন্ধান পেল না। ১৯৪২ এর আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সরকার বহু চেষ্টা করেও জল্লেশবাবুকে ধরতে পারেনি। তাঁর নামে হুলিয়া বের করেছিল সরকার, শেষে উনি স্বেচ্ছায় ধরা দেন। বিচারে কিন্তু জল্লেশবাবুর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ সরকার সংগ্রহ করতে পারল না। জল্লেশবাবু মুক্তি পেলেন। শেষে সরকার 'কমিউনিষ্ট' আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র গড়ে তোলে। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব চার্জ গঠন করা হয়েছিল—তাতে তাঁকে চরম দণ্ড দেওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল। জল্লেশবাবু বুঝলেন, এবার ধরতে পারলে, সরকার তাঁকে রেহাই দেবে না। তিনি হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন।

ইভা দেবীর বাবা ইতিপূর্বেই গতায়ু হয়েছিলেন।

জল্লেশবাবুর অন্তর্ধানের পর নিরুপায় ইভা দেবীর ওপর

পুলিশের জুলুমটা একটু বেশী মাত্রায় হতে লাগল। তখন রায়বাহাদুর সনাতন সরখেল—পুলিশের জুলুম থেকে ইভা দেবীকে রক্ষা করলেন। রায়বাহাদুর সনাতন সরখেল ইভা দেবীর পিতৃবন্ধু। ইভা দেবী তখন থেকেই রায়বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কাজ করছেন।

—'বিপ্লবী ভৈরব' তো মারা গেছে ?

প্রশ্ন করল ও. সি.।

—হ্যাঁ, তাঁর অন্তর্ধানের বছর খানেক পরে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, পশ্চিম জার্মানীর রুড় সহরের কাছাকাছি এক ট্রেণ দুর্ঘটনায় ভারতীয় বিপ্লবী, 'বিপ্লবী ভৈরব' মারা গেছে।

আপনি তো ওঁদের পারিবারিক ডাক্তার ছিলেন ?

—হ্যাঁ। জল্লেশবাবুর বাবার অসুখে প্রথম ও বাড়ীতে আমি ডাক্তারী করি। তারপর থেকে আমাকেই ওঁরা ডাকতেন।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব,—ইভা দেবীর কি 'নর্ম্যাল হ্যাবিট' ছিল ?

—তিনি অতি শান্ত-স্বভাবা ছিলেন। আমি ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁকে জানতাম—কোন abnormality of habits তাঁর ছিল বলে মনে হয় নি। পাড়ায় অবশ্য ইভা দেবীর সুনাম ছিল না। রামতারণবাবুর কথাতেই আপনি তা জানতে পেরেছেন। মিস্ চৌধুরী খুব সোশ্যাল ছিলেন না—। আর রায়বাহাদুরের কিছু চারিত্রিক দুর্নাম আছে,—সুতরাং তাঁর

অধীনে চাকরী গ্রহণ করায়—লোকের মনোভাব ইভা দেবীর ওপর খুব প্রীতিকর ছিল না। একে বাঙ্গালী ঘরের অনূঢ়া যুবতী,—আর রায়বাহাদুরের মত লোকের অভিভাবকত্ব—বুঝতেই পারছেন, লোকের মনের অবস্থা। কথায় বলে, একে মা মনসা, তার ওপর ধুনোর গন্ধ।

কথা শেষ করে ডাক্তার বোস হেসে ফেলল।

অফিসারের হাস্যধ্বনিও মিলিত হল তার হাসির সাথে।

—আচ্ছা, আমি এবার উঠি।

ডাক্তার বোস বলল।

—আচ্ছা, আসুন।

প্রত্যাভিবাদন করল অফিসার।

ডাক্তার বোস বেরিয়ে যেতেই ও. সি. মানদাকে নিয়ে আসতে বলল।

কনেষ্টবল মানদাকে নিয়ে এসে ও. সি.র সামনে দাঁড় করাল। ও. সি. মানদাকে জিজ্ঞাসা করল—যা যা জিজ্ঞাসা করব, যদি ঠিক সত্য কথা বল, তবে তোমায় ছেড়ে দেব। আর যদি মিথ্যে বল—তবে জেলে পুরে রাখব।

—আমায় ছেড়ে দিন দারোগাবাবু, আমি কিছু জানি না।

কেঁদে দারোগার পা জড়িয়ে ধরল মানদা।

—ওঠ ওঠ পা ছাড়। তুমি যা জান—তাই বলবে। আচ্ছা বলত, তোমার দিদিমণি বিয়ে করেনি কেন?

—সে কথা আমি কি করে জানব?

—দিদিমণি তো তোমায় খুব ভালবাসত,—তার সুখ-দুঃখের কথা তোমাকে কিছু বলত না ?

—তা বলবে নি কেন ? বিয়ে তাকে কে দেবে যে বিয়ে করবে ? দাদাবাবুর যখন মরার খবর বেরুল—দিদিমণির তখন কি কান্না গো—দেখলে পাষাণ গলে যায়। আহা কাঁদবে নি,—ভাইয়ের মত ভাই ছিল গো। দুদিন, দরজা বন্ধ করে—না খেয়ে পড়ে ছিল দিদিমণি। তারপর ঐ ডাক্তার বাবু কত করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে দিদিমণির দরজা খোলাল,—তাকে খাওয়াল। ডাক্তারবাবু তখন রোজ আসত, হাসি-গল্প করে দিদিমণির মন ভুলিয়ে রাখত। ডাক্তারবাবু খুব ভাল লোক গো। দিদিমণির দুঃখের কপাল গো,—বাপ গেল, ভাই গেল, বিয়ে থাওয়াও হল না। পরের চাকরি করে খেতে হল শেষে।

—তোমার দিদিমণি যে বাবুর চাকরি করত, সে কেমন লোক ?

—নোক খুব ভাল। বড়বাবুর বন্ধুনোক কিনা—তাই দিদিমণিকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসত। দিদিমণির যাতে কোন কষ্ট না হয় সেজন্য অনেক টাকা মাইনে দিত।

—তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ ?

—সেই কর্তাবাবুর আমল থেকে। দশ-বার বছর হল।

—তুমি পুরানো লোক,—আহা, তোমার তো কষ্ট হবেই। তা এখন তুমি কোথায় যাবে, দেশ কোথায় তোমার ?

—দেশে গিয়ে আর কি করব দারোগাবাবু,—সেখানে কি খুঁটে খাওয়ার দানা আছে? স্বামী-পুত্তুর তো নেই—এক দেওর-পো আছে; তা তারই দিন চলে না।

—দেশ কোথায় তোমার?

—ডায়মণ্ডহারবার।

—তুমি ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কাজ করবে?

—আমাদের ডাক্তারবাবু? তেনার নোক দিয়ে কি হবে? ঘরে তো বউ ছেলেমেয়ে নেই গো!

—ডাক্তারবাবুর লোকের দরকার,—আমাকে বলেছেন। তুমি যদি থাক, তবে ডাক্তারবাবুকে বলে ঠিক করে দিই।

—ডাক্তারবাবু যদি রাখে তো থাকব। দিদিমণির সঙ্গে ডাক্তারবাবুর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল গো।

—তাই নাকি?

হ্যাঁ; একদিন আড়াল থেকে আমি শুননু ডাক্তারবাবু আর দিদিমণি বিয়ের কথা বলছে।

ঝিয়ের কথা শুনে, অফিসার কি যেন একটু চিন্তা করল। পরে ঝিকে বলল,—আচ্ছা; ওবেলা এসে ডাক্তারবাবু তোমায় নিয়ে যাবে। এবেলা এখানেই খাওয়া-দাওয়া কর।

দণ্ডায়মান কনেষ্টবলকে ও. সি. বলল,—মানদার ভাল খাবার বন্দোবস্ত করবে,—এবেলা ও লক্ আপেই থাকবে।

কনেষ্টবল মানদাকে নিয়ে চলে গেল।

ও. সি. দুজন কনেষ্টবলকে নিয়ে জীপে গিয়ে উঠল।

পাঁচ—

রায়বাহাদুর সনাতন সরখেল তাঁর ঘরে বসে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন।

একজন চাকর এসে খবর দিল, পুলিশের লোক এসেছে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

পুলিশের নাম শুনে বিরক্তিতে রায়বাহাদুরের ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

তিনি নীচে নেমে এলেন।

মুখে অভ্যস্ত সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে তুলে ও. সি.কে প্রত্যাভিবাদন করলেন রায়বাহাদুর।

ও. সি বলল,—একটি জরুরী প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

—না না বিরক্ত হব কেন, আপনারা সরকারের প্রতিভূ—আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন। আমাদের জাতীয় সরকার,—আমাদের সকলেরই সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করা উচিত। বলুন, আমাকে দিয়ে আপনার কি প্রয়োজন?

—মিস্ ইভা চৌধুরী সম্বন্ধে কিছু জানতে এসেছি। কাল কত রাত্রে উনি এখান থেকে গিয়েছেন? তিনি শারীরিক সুস্থ ছিলেন কি?

পুলিশের মুখে ইভার নাম শুনে রায়বাহাদুরের হৃদ্‌পিণ্ডটা

ধ্বক্ করে উঠল। পুলিশ অফিসারকে কোন সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন,—কেন, ইভার কি কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে? ইভা তো বেশ সুস্থ অবস্থাতেই এখান থেকে গেছে।

—কাল রাত্রে ইভা দেবী মারা গেছেন।

—ইভা মারা গেছে!

রায়বাহাদুরের গলায় স্পষ্ট বিস্ময়ের সুর ফুটে উঠল।

রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। কোন কথা বললেন না তিনি। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর চোখ খুলল।

অফিসার বললেন,—আমি শুনেছি,—আপনি মিস্ চৌধুরীকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুতে আপনার দুঃখ পাওয়াটা স্বাভাবিক। তবুও ইভা দেবীর মৃত্যুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

—দেখুন অফিসার, ইভা শুধু আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল না; সে ছিল আমার মৃত বন্ধুর কন্যা। এবার হয়ত বুঝতে পারছেন, তাকে আমি কতটা স্নেহ করতাম। কাল রাত্রে সে চাকরীতে রিজাইন দিয়ে গেল,—আর আজই তার মৃত্যু সংবাদ শুনছি। কি যেন একটা গূঢ় রহস্য রয়েছে এর মধ্যে।

—ইভা দেবী রিজাইন দিয়েছিলেন কাল?

—হ্যাঁ। হঠাৎ আমায় বলল,—কাজ করতে আর তার ভাল লাগছে না। আমি বললাম, বেশ তো কিছুদিন ছুটি

নিয়ে বিশ্রাম কর। কিন্তু ইভা ছুটি চায় না, রিজাইন দেবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে। পিতৃহীনা বন্ধু কন্যাকে আমি একটু প্রশ্রয়ই দিতাম। ভাবলাম, জেদী মেয়ে, যা চায় তাই করুক। আর ঠিক প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধও তো আমাদের মধ্যে ছিল না—। কাল কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে ইভার বাসায় ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। আমার ড্রাইভার তাকে সুস্থ দেহে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছে। আমার ড্রাইভারকে ডাকছি—তার মুখেই শুনুন।

রায়বাহাদুর বেল টিপতেই গোবিন্দ-চাকর এসে দাঁড়াল। তাকে রায়বাহাদুর বললেন,—আব্দুলকে ডেকে দে তো ?

কিছু পরেই আব্দুল এসে উপস্থিত হ'ল ঘরে।—রায়বাহাদুর তাকে প্রশ্ন করলেন,—আব্দুল কাল রাত্রে দিদিমণিকে তুমি ভালভাবে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলে তো ?

—হ্যাঁ বাবু।

—রাস্তায় কোন কিছু ধাক্কা-টাক্কা লাগেনি তো ?

—না, বাবু।

—আচ্ছা, তুমি যাও।

আব্দুল চলে যেতেই রায়বাহাদুর বললেন,—শুনলেন তো সব।—আচ্ছা, তার মৃত্যু-খবর আপনাদের কে জানাল ?

—মিস্ চৌধুরীর পারিবারিক ডাক্তার—ডক্টর জয়ন্ত বোস। ইভা দেবী বেশী বেলা পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠছেন না দেখে, তাঁর ঝি—ডাক্তার বোসকে ডেকে নিয়ে আসে।

ডাক্তার বোসের সন্দেহ হওয়ায়, তিনি আমাদের টেলিফোন করেন। আমি গিয়ে দরজা ভেঙ্গে তাঁকে মৃত অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখি।

—ইভা যে এভাবে আমাদের ছেড়ে যাবে—কে জানত? ইভাকে যে আমি কত স্নেহ করতাম, আপনি বুঝতে পারবেন না অফিসার। দুঃখ যত বড়ই হোক—কর্তব্য না করে উপায় নেই। ইভার শেষ কাজ এখন আমাকেই করতে হবে। তা ইভার ডাক্তার কি বলল,—কি হয়ে ইভা মরেছে।

—উনি তো বললেন, heart failure।

—একটা death certificate লিখে দিয়েছেন তো?

—আজ্ঞে না, লাশ পোষ্ট-মর্টম' করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—Post Mortem! আমাকে না জানিয়ে এ কাজ করা আপনার অন্যায় হয়েছে। ইভার একমাত্র অভিভাবক আমি,—আমাকে আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। ধরুন, ভদ্রঘরের যুবতী মেয়ে যদি কোন লজ্জাকর পরিস্থিতির হাত এড়াতে আত্মহত্যাই করে থাকে,—তবে তার মৃত্যুর পরও কি আমাদের উচিত নয় তার এ লজ্জাকর ইতিহাস প্রকাশ না করা? অবশ্য আমি জানি না, সত্যই এরকম কোন কারণ তার জীবনে ঘটেছিল কি না—তবে আজ তার মৃত্যু সংবাদ শুনে এবং কাল তার রিজাইন দেবার মধ্যে

একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ যেন অনুমান করতে পারছি। আর যদি কোন কারণে হার্টফেল করে তার মৃত্যু হয়ে থাকে—তবে তো পোষ্ট-মর্টমের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—দেখুন, মৃত্যুর কারণ যখন সন্দেহাতীত নয়,—সেক্ষেত্রে পোষ্ট-মর্টম করা ছাড়া উপায় কি? আমি বুঝতে পারছি রায়বাহাদুর, ইভা দেবী আপনার স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তাঁর শব-ব্যবচ্ছেদ দৃশ্য আপনার পক্ষে পীড়াদায়ক—কিন্তু কি করব, কর্তব্যের অনুরোধে অনেক অপ্রীতিকর কাজ আমাদের করতে হয়। আর যদি সত্যই কোন মৃত্যুরহস্য থেকে থাকে, সেটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত নয় কি?

—আপনি পুলিশের লোক—আমার উক্তির মর্ম আপনি বুঝবেন না। লাশ যখন পোষ্ট-মর্টম করতে চলেই গেছে—এখন এ নিয়ে তর্ক করে আর লাভ নেই। আমাকে আর কিছু আপনার জিজ্ঞাস্য আছে কি?

—আজ্ঞে না।

রায় বাহাদুর চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন,—আমি এখন একটু একা থাকতে চাই। পোষ্ট-মর্টম রিপোর্টটা যদি ফোনে আমাকে জানান—বড় বাধিত হব।

—নিশ্চয়ই জানাব।—আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার।

পুলিশ অফিসার চলে গেল।

রায়বাহাদুর ওপরে উঠে এলেন। তিনি পাকা ব্যবসাদার। ব্যবসাও তাঁর হরেক রকমের। গত যুদ্ধের সময় থেকে নূতন ধরণের অনেক ব্যবসা তাঁর সাবেকী ব্যবসার সঙ্গে যোগ হয়েছে। কর্মচারীদের ভুলচুকে পুলিশের হাঙ্গামা তাঁকে পোহাতে হয়েছে অনেকবার—অবশ্য তাঁর প্রতিপত্তির নির্ভরতায় বেগ পেতে হয় না বিশেষ কিছু। তবুও এই ঝামেলা বিরক্তিকর।

বিশেষ করে ইভার ব্যাপারে তিনি আজ বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ইভা সন্তান-সম্ভবা ছিল ময়না তদন্তে তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। পুলিশ ভাববে, কুমারী মেয়ে লজ্জার হাত এড়াতে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশকে তিনি নিজেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু কে তার সন্তানের পিতা, পুলিশ তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই। পুলিশের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে—তাও ঠিক। ইভা মরেছে ভালই—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রায়বাহাদুর নিশ্চিন্ত। তবুও পোষ্ট-মর্টম ব্যাপারটা ঘটতে না দিলেই ভাল হত। একদিনে সব ঝামেলা চুকে যেত।

রায়বাহাদুর ঘরময় পায়চারি করছেন;—এই সব চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে কিলবিল করছে।

পায়চারি করতে করতে রায়বাহাদুর জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—স্যার।

'স্যার' ডাকে রায়বাহাদুরের চিন্তা-সূত্রে ছেদ ঘটল। পেছন ফিরে দেখলেন, বিজয় এসে দাঁড়িয়েছে।

—স্যার, ওয়াটগঞ্জের গুদাম থেকে কিছু চাল সোনারপুর পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন, আজ পাঠিয়ে দেব কি ?

—দাও।

নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন রায়বাহাদুর।

বিজয় চলে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার ফিরে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করল,—স্যার. আপনাকে যেন একটু কেমন দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ করে নি তো স্যার ?

—শরীর খারাপ ?—না, তা ঠিক নয়—। তুমি বোধ হয় শোননি, কাল রাত্রে ইভা মারা গেছে।

—হঠাৎ মারা গেলেন ! কি হয়েছিল, স্যার ?

—হার্টফেল করেছে। পুলিশ কিন্তু সন্দেহ করছে তার মৃত্যুটা নাকি স্বাভাবিক নয়। ইভা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?

—আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন স্যার ? 'হ্যাঁ' বলব—না, 'না' বলব স্যার ?

—বিজয় তুমি কি কোনদিন 'সিরিয়স' হতে পারলে না ?

—'সিরিয়স' ? কি বলছেন স্যার, আমি 'সিরিয়স' লোক

না হলে কি এত লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স্ ভারী করে তুলতে পেরেছি? আমি এত 'সিরিয়স' যে, নিজেকেই নিজে ভয় করতে আরম্ভ করেছি। পুলিশ এতে হাত দিয়েছে বলছেন—কোন্ উত্তরটা হলে আপনার সুবিধা হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—ইভা কি আত্মহত্যা করতে পারে বলে, তোমার মনে হয়? তার এরকম করবার মত কারণ ছিল কি কিছু? তোমার নিজের অভিমত বল।

—আমার অভিমত,—মেয়েদের সম্বন্ধে? ওরে বাবা! ওটা তো আপনার এলাকা, স্যার। মেয়েদের ব্যাপারে আপনিই ভাল বোঝেন। আমার যেটুকু বলবার,—পুলিশ যখন গন্ধ পেয়েছে,—তাতে একটু সাবধান হওয়া দরকার বই কি স্যার!

—সাবধান হব, কেন?

—কাল রাত্রে ইভা দেবী যে এখানে খেয়ে গিয়েছিলেন, সে কথাটা পুলিশের কাছে চেপে যাওয়াই ভাল।

বিজয়ের কথা শুনে রায়বাহাদুর বিস্মিত-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,—ইভা কাল রাত্রে এখানে খেয়েছিল, এ কথা তোমায় কে বলল?

—আমি জানি। কাল রাত্রে বেলেঘাটা উদ্বাস্তু কলোনীর ব্যাপারটা নিয়ে আপনি আমায় আসতে বলেছিলেন,—সে কথা আপনি ভুলে গেছেন হয়ত। আমি এসেছিলাম। আপনি তখন ইভা দেবীর সঙ্গে জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

—আর কি শুনেছ তুমি ?

—সবই শুনেছি, আপনার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে।

—সবই শুনেছো তুমি! পুলিশের কাছ থেকে সাবধান হতে বলছ আমাকে,—নয় ?

—কেন না, আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী আমি।

—আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ? স্কাউনড্রেল,—ইভাকে হত্যা করে, তার ত্রিশ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে—আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হতে এসেছ ? জান,—ইভাকে যে নোটগুলো দিয়েছি—তার নম্বর আমার জানা আছে;—পুলিশের হাতে তোমাকে হ্যাণ্ডওভার করে দিতে পারি—এই মুহূর্ত্তে।

ক্রুদ্ধ রায়বাহাদুরের কথা শুনে বিজয় হো হো করে হেসে উঠল।

—চমৎকার! ইভা প্রতিজ্ঞা করলেও—তার ভাবী সন্তানের পিতা ইভাকে বিশ্বাস করতে পারেনি, তাই ভবিষ্যতে যাতে কোনদিন নিজের কলঙ্ক প্রকাশ না হয়ে পড়ে—সেজন্য ইভাকে হত্যা করেছেন আপনি। যে মেয়ে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা চেয়ে নিয়ে যায়—সে, আত্মহত্যা করতে পারে না। যদি আত্মহত্যাই করবে, টাকা নিয়ে যাবার তার কি প্রয়োজন ছিল ? টাকার নম্বরের কথা বলছেন,—পুলিশ যখন জিজ্ঞাসা করবে—এত টাকা ইভাকে কেন দিয়েছিলেন,—তার উত্তরটাও দিতে নিশ্চয়

আপনার অসুবিধে হবে না, আশা করি। আমার ঘাড়ে ইভার হত্যাদায় চাপাবার চেষ্টা করলে, [illegible] জালে নিজেই জড়িয়ে পড়বেন রায়বাহাদুর। কেন শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন রায়বাহাদুর? আপনার এখানে কাজ করতে এসে প্রথম ভাগে যে সব নীতি কথা পড়েছিলাম তা ভুলে গেছি;—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিরও কোন মূল্য নেই এখানে—তাও জেনেছি। তাই অতি যত্ন করে আয়ত্ত করেছি নূতন পাঠ। সে নূতন পাঠের শিক্ষাগুরু আপনি। জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যাকথা, লোকঠকানো—সবই তো একসঙ্গে করছি আমরা। সাধু আমরা কেউ নই। তবে ইভার ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, সেজন্য আমাকে জড়াবার চেষ্টা করবেন না। আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না, বিশ্বাস করতে পারেন।

—বিজয় তুমি যত চালাকই হও, ভুলে যেও না আমি রায়বাহাদুর সনাতন সরখেল।

তাঁর কথা শেষ হতেই মাজা বেঁকিয়ে অতি বিনীতভাবে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বিজয় বলল,—আর আমি রায়বাহাদুর সনাতন সরখেলের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীবিজয় মাধব চট্টরাজ।

রায়বাহাদুর ক্রুদ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বিজয়কে দেখলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন শব্দ উচ্চারিত হল না। এ যেন রায়বাহাদুরের শক্তিমান প্রতিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সুযোগের অন্বেষণ।

বিজয় কিন্তু সপ্রতিভ ভাবেই বলল,—সোণারপুর, গুদামে চাল পাঠাবার ব্যবস্থা করে আজ বিকেলে আপনাকে খবর দিয়ে যাব।

রায়বাহাদুর কোন কথা বললেন না। বিজয়ের দিকে পেছন ফিরে পূর্বোক্ত জানালার দিকে অগ্রসর হলেন।

বিজয়ের মুখে অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল।

বিজয় বলল,—কিছু টাকার যে দরকার ছিল স্যার?

রায়বাহাদুর তার দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করলেন,—

কত টাকা?

—হাজার পাঁচেক।

রায়বাহাদুর এবার বিজয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন,—এত টাকা কিসে লাগবে?

চাল পাঠানোর জন্যে লরীভাড়া ইত্যাদিতে কিছু লাগবে। আর আমার নিজের জন্যেও কিছু টাকার প্রয়োজন।

—হুঁ, অত টাকা তো এখন নেই।

—তা জানি,—একখানা চেক দিন, ভাঙ্গিয়ে নেব।

রায়বাহাদুর কোন কথা না বলে, ড্রয়ার থেকে চেক বই টেনে নিয়ে একখানা চেক লিখে দিলেন।

বিজয় হাত বাড়িয়ে চেকটা নিতেই রায়বাহাদুর বললেন, —কেউটের লেজে পা দিয়েছ বিজয়, সাবধান।

বিনয়ের অবতার মূর্তিতে বিজয় বলল,—আমার ওপর অবিচার করছেন স্যার। আমি আপনার চির-অনুগত বিজয়।

চেকটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়ে বিজয় বলল,—আচ্ছা, এখন চলি স্যার।

বিজয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিজয় চলে যেতেই,—তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রায়বাহাদুর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,—স্কাউনড্রেল! তোমার দম্ভ আমি পায়ের নীচে পিষে ফেলব।

ছয়—

ডাঃ বোসের চেম্বারের সামনে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। থানা থেকে ফিরে ডাক্তার বোস চেম্বারেই বসে আছে।

ইভার লাশ পোষ্ট-মর্টম করতে নিয়ে গেছে। তার বাড়ীর দরজায় পুলিশ প্রহরী।

পাড়ার বেকার ছেলেরা—আজ তাদের গলির মোড়ে চায়ের দোকানে 'হাফ কাপ' চা সামনে করে বসে ইভার ব্যাপার নিয়েই তুমুল তর্ক তুলেছে। কেউ কেউ ডাক্তার বোসের কাছেও এসেছিল,—সঠিক খবর শোনবার জন্যে।

এরকম একটা আকস্মিক মৃত্যুতে কৌতুহল হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাড়ার যুবকেরা কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতিক্রিয়া বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইভার জীবিত অবস্থায় তার প্রতি কুৎসিত মন্তব্যও যারা করেছে, আজ তার মৃত্যুতে, তাদের মনোভাবও উদার। তারাই আজ নানা যুক্তির অকাট্যতায় প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, অভিভাবকহীনা অসহায় যুবতী যদি পিতৃবন্ধুর অধীনে চাকরি করে—তাতে দোষের তো কিছু নেই। এ ছাড়া তার উপায়ই বা কি ছিল? কোন যুবক তো তখন তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায় নি? তারা তখন শুধু

তার চালচলন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে—তার রূপের নেশায় শুধু জ্বলেই মরেছে—। আজ মৃতের প্রতি সহানুভূতিটাই তাদের প্রধান হয়ে উঠেছে,—নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করতেও তারা আজ লজ্জিত নয়।

বয়স যাদের বেশী, তারা শুধু তাদের বেশী বয়সের বিজ্ঞাপনের জোরে ইভাকে স্বৈরিণীর পর্যায় ফেলতে এতটুকুও দ্বিধা করেনি। সমস্ত যুক্তি তর্ক তাদের বয়সের সন তারিখের অভিজ্ঞতায় অসার। ইভার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তাদের কৌতূহলও কম নয়—একটা রসালো কেচ্ছার খবর শোনবার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব।

ডাক্তার বোস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বেলা প্রায় বারোটা।

বাসায় ফেরার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাঃ বোস। বাসা তার কেশব সেন ষ্ট্রীটে। ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল:

—হ্যালো।

—ডক্টর বোস?

—হ্যাঁ বলুন।

—আজ বিকেলের দিকে একবার আসুন না? পোষ্ট-মর্টম রিপোর্টটাও জেনে যাবেন—আর ইভা দেবীর ঝি সম্বন্ধে একটু কথা আছে।

—আচ্ছা যাব। মানদার বিষয়ে কি বলছিলেন?

ছয়—

ডাঃ বোসের চেম্বারের সামনে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। থানা থেকে ফিরে ডাক্তার বোস চেম্বারেই বসে আছে।

ইভার লাশ পোষ্ট-মর্টম করতে নিয়ে গেছে। তার বাড়ীর দরজায় পুলিশ প্রহরী।

পাড়ার বেকার ছেলেরা—আজ তাদের গলির মোড়ে চায়ের দোকানে 'হাফ কাপ' চা সামনে করে বসে ইভার ব্যাপার নিয়েই তুমুল তর্ক তুলেছে। কেউ কেউ ডাক্তার বোসের কাছেও এসেছিল,—সঠিক খবর শোনবার জন্যে।

এরকম একটা আকস্মিক মৃত্যুতে কৌতুহল হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাড়ার যুবকেরা কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতিক্রিয়া বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইভার জীবিত অবস্থায় তার প্রতি কুৎসিত মন্তব্যও যারা করেছে, আজ তার মৃত্যুতে, তাদের মনোভাবও উদার। তারাই আজ নানা যুক্তির অকাট্যতায় প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, অভিভাবকহীনা অসহায় যুবতী যদি পিতৃবন্ধুর অধীনে চাকরি করে—তাতে দোষের তো কিছু নেই। এ ছাড়া তার উপায়ই বা কি ছিল? কোন যুবক তো তখন তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায় নি? তারা তখন শুধু

তার চালচলন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে—তার রূপের নেশায় শুধু জ্বলেই মরেছে—। আজ মৃতের প্রতি সহানুভূতিটাই তাদের প্রধান হয়ে উঠেছে,—নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করতেও তারা আজ লজ্জিত নয়।

বয়স যাদের বেশী, তারা শুধু তাদের বেশী বয়সের বিজ্ঞাপনের জোরে ইভাকে স্বৈরিণীর পর্যায় ফেলতে এতটুকুও দ্বিধা করেনি। সমস্ত যুক্তি তর্ক তাদের বয়সের সন তারিখের অভিজ্ঞতায় অসার। ইভার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তাদের কৌতূহলও কম নয়—একটা রসালো কেচ্ছার খবর শোনবার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব।

ডাক্তার বোস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বেলা প্রায় বারোটা।

বাসায় ফেরার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাঃ বোস। বাসা তার কেশব সেন ষ্ট্রীটে। ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল ঃ

—হ্যালো।

—ডক্টর বোস ?

—হ্যাঁ বলুন।

—আজ বিকেলের দিকে একবার আসুন না ? পোষ্ট-মর্টম রিপোর্টটাও জেনে যাবেন—আর ইভা দেবীর ঝি সম্বন্ধে একটু কথা আছে।

—আচ্ছা যাব। মানদার বিষয়ে কি বলছিলেন ?

—মানদাকে আমি ওয়াচ করব,—কিন্তু সেটা ওকে জানতে দিতে চাই না। ওকে ছেড়ে দেব ;—আপনার বাড়ীতে কাজ করবে, ও বলেছে। কদিন যদি আপনার বাড়ীতে ওকে ঝি করে রাখেন—সেই অনুরোধ করছিলাম।

—বেশ মানদা আমার বাড়ীতেই থাকবে।

—ধন্যবাদ। কখন আসছেন ?

—এই ধরুন পাঁচটায়।

—আচ্ছা, তাই আসবেন। নমস্কার।

—নমস্কার।

ডাক্তার বোস রিসিভার রেখে দিল। কিন্তু তার কপালে কুঞ্চন রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সাত—

বিকেলে থানায় যেতেই ডাক্তার বোসকে অভ্যর্থনা করে অফিসার বলল,—আসুন, আপনারই অপেক্ষা করছি।

চেয়ারে বসতে বসতে ডাঃ বোস বলল,—রিপোর্ট পেয়েছেন?

—এইমাত্র পেলাম। ব্রেণ প্যারালিসিস হয়ে ইভা দেবীর মৃত্যু হয়েছে।

—ব্রেণ প্যারালিসিস?

—হ্যাঁ—অদ্ভুত এই রোগ। অভিজ্ঞদের মতে রোগটি এত তীব্র ও দ্রুতপ্রসারি যে, রোগ আক্রমণের কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হতে পারে। তীব্র দুঃখ বা আনন্দ —এ দুটোর যে কোন কারণেই ব্রেণ শক্‌ড্‌ হয়ে এ রোগ হতে পারে। প্রথমে ব্রেণ শক্‌ড্‌ হয়, তারপর আস্তে আস্তে শরীরের সমস্ত নার্ভগুলো অসার হয়ে গিয়ে রোগী মারা যায়।

—আমি কিন্তু এ ধরণের অদ্ভুত রোগের কথা আমার ডাক্তারী জীবনে কোনদিন শুনি নি।

—অনেকেই শোনেন নি। খুব রেয়ার কেস—এ কথাই তো ডাক্তার সাহেব বললেন।

একটু চুপ করে থেকে ও. সি. আবার বলল,—আচ্ছা, মিস্ চৌধুরীর রায়বাহাদুরের চাকরীতে 'রিজাইন' দেওয়া সম্বন্ধে আপনাকে কোনদিন কিছু বলেছিলেন কি?

—কই না, 'রিজাইন' দেওয়া সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে জানান নি।

—রায়বাহাদুর বললেন,—চাকরীতে উনি কাল রাত্রেই 'রিজাইন' দিয়েছিলেন। রায়বাহাদুর তো ইভা দেবীকে খুবই স্নেহ করতেন,—অথচ ইভা দেবী কেন 'রিজাইন' দিলেন,—সে কথা তিনিও জানেন না। রায়বাহাদুরকে আপনার কি রকম মনে হয়?

—দেখুন, ইভা দেবী আত্মহত্যাও করেন নি বা তাঁকে হত্যা করাও হয়নি। এক অদ্ভুত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—এর জন্যে রায়বাহাদুর বা অন্য কাউকে কি করে সন্দেহ করা যায়?

—না, সন্দেহ আমি কাউকে করছি না। পোষ্ট-মর্টম রিপোর্টের পর আর সন্দেহের কোন প্রশ্নই থাকে না। তবে আপনার কি মনে হচ্ছে না,—এমন কোন মানসিক আঘাত ইভা দেবী কাল পেয়েছিলেন যার কারণে ব্রেণ প্যারালিসিস হয়ে তাঁর মৃত্যু হল। কাল শেষ কখন আপনি তাঁকে দেখেছিলেন?

—আমি পশু রাত্রে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম।

—তাঁকে কেমন দেখেছিলেন, অর্থাৎ আলাপ-আলোচনায় এমন কিছু কি তিনি বলেছিলেন যা দুঃখ-দায়ক বা আনন্দ-দায়ক।

—না,—এমন কোন কথা তো তিনি কিছু বলেন নি।

দেখুন অফিসার, ইভা দেবীর এই হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি আমি, আর আমার কাছে এই দুর্ঘটনা ততোধিক বেদনাদায়ক। প্রথমটা সঙ্কোচে আপনাকে বলতে পারিনি ;—পারিবারিক চিকিৎসক ছাড়াও ইভা দেবীর সঙ্গে আমার এক বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। ভগবান বিরূপ না হলে, আমাদের এই অন্তরের নৈকট্য সামাজিক বন্ধনের ভেতর দিয়ে দৃঢ়তর হয়ে ওঠবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

—ডক্টর বোস, আপনি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আপনার বেদনায় আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি ডক্টর বোস।

—ধন্যবাদ অফিসার। আমি ভাবছি কত তাড়াতাড়ি একটা গোটা পরিবার পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে গেল।

ডাক্তার বোসের কণ্ঠে স্পষ্ট বৈরাগ্যের সুর বেজে উঠল। ডাক্তার বোস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল,—আমি এবার আসি অফিসার। মানদা কি আমার সঙ্গে যাবে ?

—যদি আপনার কোন অসুবিধে না হয়'—। আর, মানদাও আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

—আচ্ছা, ওকে ডাকুন।

ও. সি. একজন কনেষ্টবলকে বলল—মানদাকে নিয়ে আসতে।

মানদা এসে দাঁড়াতেই ও, সি, বলল,— তুমি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে যাও।

—দিদিমণির বাড়ী আর কোনদিন যেতে পাবো নি? ওখানে আমার জিনিষ পত্তর আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার জিনিষ পত্তর তুমি নিয়ে যেতে পারবে।

একজন লিটারেট কনেষ্টবলকে ডেকে ও. সি. বলল, যোগেশবাবু, আপনি এঁদের সঙ্গে যান। মানদার যা জিনিষ-পত্তর ইভা দেবীর বাসায় আছে,—তার একটা লিষ্ট করে মানদাকে জিনিষগুলো দিয়ে দেবেন। সাক্ষী হিসেবে ডাক্তার বোস আপনার কাগজে একটা সহি দিয়ে দেবেন।

প্রত্যাভিবাদনের পালা শেষ করে ডাঃ বোস, যোগেশবাবু আর মানদাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ও. সি. ফোন তুলে একটা নম্বর চাইল।

—রায়বাহাদুর? নমস্কার। ও. সি: আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কথা বলছি।

—বলুন। রিপোর্ট পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, 'ব্রেন প্যারালিসিস' রোগে ইভা দেবীর মৃত্যু হয়েছে।

রায়বাহাদুরের কাছ থেকে আর কোন সাড়া না পেয়ে ও. সি: ডাকল,—হ্যালো! হ্যালো!

—ব্রেণ প্যারালিসিস। আত্মহত্যা বা অন্যরকম কোন কিছু নয়? Nothing of any crime?

—না।

—ধন্যবাদ, আপনার এই সংবাদের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম।

রিসিভারটা আস্তে নাবিয়ে রাখলেন রায়বাহাদুর। তাঁর মুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত ধরণের হাসি—কপালে কুঞ্চন রেখা, অধরোষ্ঠ ঈষৎ বক্র; এ হাসির সঠিক কোন সংজ্ঞা নেই।

পরের দিন খবরের কাগজে বড় হেড লাইন দিয়ে খবর বেরল।

আট—

"যুবতীর অত্যাশ্চর্য মৃত্যু

ময়না তদন্তে মৃত্যুরহস্য আবিষ্কার।"

সকালবেলা চায়ের ট্রে সাজিয়ে টেবিলে এনে রাখতেই কাগজের উপরোক্ত হেড লাইনটি শ্যামলীর চোখে পড়ল।

কাগজখানা তুলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে লিখিত বিবরণ-টুকু শ্যামলী পড়ে ফেলল।

"ঘটনার বিবরণে প্রকাশ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর সনাতন সরখেলের যুবতী প্রাইভেট সেক্রেটারী পশু সন্ধ্যায় কোন অজ্ঞাত কারণে চাকরিতে ইস্তফা দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। রাত্রিতে যথারীতি নিদ্রা যায়। কিন্তু পরদিন সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঝিয়ের ডাকাডাকিতেও তাহার ঘুম না ভাঙ্গায়, প্রতিবেশী ডাক্তার ও ঐ পরিবারের গৃহচিকিৎসক ডাঃ জয়ন্ত বোসকে ঝি ডাকিয়া আনে। ডাক্তার বোসের সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ শয়নকক্ষের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া যুবতীকে তখনও গভীর নিদ্রামগ্ন দেখিতে পায়। ডাঃ বোস যুবতীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাহাকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ময়না তদন্তের ফলে জানা যায় যে, কোন প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ের দরুণ

যুবতী 'ব্রেণ প্যারালিসিস্' রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই রাত্রিতেই প্রাণত্যাগ করে।

যুবতীর পরিচয়,—সে আপামর শ্রদ্ধেয় "বিপ্লবী ভৈরবের" একমাত্র সহোদরা ছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রায় একবৎসর পূর্বে পশ্চিম জার্মানীর এক ট্রেন দুর্ঘটনায় 'বিপ্লবী ভৈরব' প্রাণত্যাগ করেন।

এক্ষণে আমাদের বলিবার কথা হইতেছে এই যে, যেহেতু যুবতীর মৃত্যুর কারণ একটি রোগ বলিয়া সাব্যস্ত হইল, পুলিশ যেন মনে না করে যে, তাহাদের আর কিছু করিবার নাই। কি সে অজ্ঞাত কারণ, যাহার ফলে যুবতী লোভনীয় পারিশ্রমিকের চাকরি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহার মানসিক আঘাত এতই প্রবল হইয়াছিল যে, অকালে ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন রোগে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইল—এ তথ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার দায়িত্ব পুলিশের এখনও রহিয়াছে।"

পড়া হয়ে গেলে, শ্যামলী কাগজখানা একপাশে সরিয়ে রাখল।

—কিরে শ্যামলী, চা হল ?

ঘরের ভেতর থেকে বিজয়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

গেঞ্জির মধ্যে মাথা গলাতে গলাতে বিজয় বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শ্যামলী গম্ভীরভাবে চা ঢালতে লাগল। তারপর একটি কাপ বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিল সে।

বিজয় শ্যামলীর গম্ভীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। কিছু না বলে চায়ে চুমুক দিল সে।

শেষে প্রশ্ন করল শ্যামলী,—কাল অত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

—কেন, তোর ভয় করছিল নাকি? বুধীর মা কালও বাড়ী গিয়ে শুয়েছিল বুঝি? না, আজই আমি বুধীর মাকে বলে দেব, যা কথা আছে তাই তাকে করতে হবে,—রাত্রে এই বাড়ীতে তাকে শুতে হবে। আমার কাজকর্মে বাড়ী ফিরতে রাত হতে পারে ভেবেই না বুধীর মাকে এখানে শোবার জন্যে আরও তিন টাকা বেশী দিচ্ছি। তা রোজই একটা না একটা ছুতো করে পালাবে?

—শুধু শুধু 'বুধীর মা' 'বুধীর মা' করে চেঁচাচ্ছ কেন? বুধীর মা রাত্রে এখানেই শুয়েছিল। তুমি কিন্তু আমার কথার উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ, দাদা?

—এড়িয়ে যাচ্ছি? কেন এড়িয়ে যাব, কি বল, কি কথা তোর?

—কাল অত রাত পর্যন্ত কি তোমার এত রাজকার্য ছিল, তাই বলছি।

—রাজকার্য হলে কি আর রাত হত? সে তো ঘরে শুয়ে

বসে চালাতে পারতাম, আর তাতেই লাফিয়ে লাফিয়ে উন্নতি হ'ত আমার। কিন্তু এ যে নিজের দায়, তাই রাত হয় বাড়ী ফিরতে।

—তোমার নিজের আবার দায় কি, কর তো, পরের চাকরি ?

—পরের চাকরিই বটে, তবে বেশী খাটুনিটা খাটি নিজের দায়ে। সোনারপুরে কাল চালের লরীর সঙ্গে যেতে হয়েছিল, তাই একটু রাত হয়ে গেল ফিরতে। আচ্ছা তুই আজকাল আমাকে এত জেরা করতে আরম্ভ করেছিস কেন ?

—কেননা, তুমি অনেক বদলে যাচ্ছ দিন কে দিন। দাদা, আগে তুমি আমাকে কোন কিছু গোপন করতে না। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, কি যেন তুমি সব সময় ভাবছ। আমাকে কিছুই বল না তুমি। এমনকি, তোমাদের ইভা চৌধুরীর রহস্যজনক মৃত্যুখবরটাও আমাকে বলোনি ? কেন আমার সঙ্গে তুমি এরকম ব্যবহার করছ ?
—কি হয়েছে তোমার, আমাকেও বলবে না তুমি ?

কথার শেষদিকে শ্যামলীর কণ্ঠস্বর অভিমানে ভারী হয়ে উঠল।

—আরে দেখ, কি সব যা তা বলছিস্ ? কি আবার হবে আমার ; কিছুই হয় নি। কাজ পড়েছে বেশী, তাই। তুইও তো দেখছিস, আজকাল সময়ই পাই না বাড়ীতে

একটু বসবার। তোকে গোপন করব কেন, গোপন করবার আছেই বা কি?

একটু চুপ করে থেকে বিজয় বলল,—ইভার মৃত্যুর খবর তুই কোথায় শুনলি?

—আজ কাগজে বেরিয়েছে।

—কই দেখি, দেখি, কি লিখেছে?

বিজয় তাড়াতাড়ি কাগজখানা নিয়ে পড়তে শুরু করল। কাগজ পড়তে পড়তে বিজয়ের মুখের ভাব পরিবর্তিত হতে লাগল। শ্যামলী তাকিয়ে দেখল বিজয়ের ভাবান্তর। প্রশ্ন করল না সে কিছু।

বিজয়ের একতালা বাড়ীর দরজায় রায়বাহাদুরের গাড়ী এসে দাঁড়াল। রায়বাহাদুর নিজে গাড়ী থেকে নেমে এসে ডাকলেন,—বিজয় বাড়ী আছ?

রায়বাহাদুরের গলার আওয়াজ পেয়ে বিজয় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

—আসুন, আসুন, হঠাৎ এ দীন কুটিরে?

—তুমি গলায় দড়ি বেঁধে টেনেছ, তাই আসতে হল।

কথা কয়টি বলে রায়বাহাদুর অমায়িক হাসি হাসলেন।

রায়বাহাদুরের অপ্রত্যাশিত আগমন ও তাঁর অমায়িক ব্যবহারে বিজয় আশ্চর্য হল। বাড়ীর দরজা থেকে ভেতরে নিয়ে এসে বসাতে হল মাননীয় অতিথিকে।

রায়বাহাত্বর এসে পড়াতে শ্যামলী ভেতরে চলে গিয়েছিল।

কাগজখানা দেখতে পেয়ে রায়বাহাত্বর বললেন,—কাগজ দেখছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল বিজয়। বিজয় রায়বাহাত্বরকে বোঝবার চেষ্টা করছে।

শ্যামলী রায়বাহাত্বরের জন্যে চা নিয়ে উপস্থিত হল।

—চা! আচ্ছা দাও।

রায়বাহাত্বর একটা কাপ তুলে নিয়ে বিজয়কে বললেন,—এটি তোমার বোন বোধ হয়?

—হ্যাঁ।

শ্যামলী হাত তুলে রায়বাহাত্বরকে নমস্কার করল।

চায়ে চুমুক দিয়ে রায়বাহাত্বর বললেন,—লরীর 'এ্যাক্‌সেল' ভেঙ্গে গিয়ে চালগুলো সব রাস্তায় পড়ে রয়েছে। তুমি তো সোনারপুরে লরী পাঠিয়ে দিয়ে চলে এসেছ। তারপর তোমার আর কোন পাত্তা নেই। আমাকে একটা খবরও দাওনি তুমি, চালগুলো পাঠানো হল কি না? আজ সকালে সেই ভাঙ্গা লরীর একজন লোক এসে আমায় জানাল এই ব্যাপার। কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকেই ছুটে আসতে হল তোমার খোঁজ নিতে।

বিজয় একবার শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে দেখল, শ্যামলীর

স্থির দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। বিজয় তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল।

—আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। জামাকাপড়টা বদলিয়ে আসছি।

বিজয় তরিৎপদে শ্যামলীর দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেল।

বিজয় ভেতরে যেতেই শ্যামলী বলল,—কাগজে পড়লাম আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীর মৃত্যুসংবাদ। আচ্ছা, ইভা দেবী কেন 'রিজাইন' দিলেন আপনিও জানেন না?

—কাগজে যা বেরিয়েছে, তার চাইতে এতটুকুও আমি বেশী জানি না। ইভা আমাকে কিছুই বলেনি, হয়ত আমাকে জানতে দেওয়ায় তার আপত্তি ছিল। আমি জানতে পারলে, কিছু একটা প্রতিকার নিশ্চয়ই করতে পারতাম।

—আপনি ইভা দেবীকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন এ কথা সবাই জানে,—অথচ আপনাকেও জানাল না?

—মেয়েদের এমন কোন কথা হয়ত থাকতে পারে, যা তারা অতি আপনজনের কাছেও বলতে পারে না।

রায় বাহাদুরের কথা শুনে শ্যামলী মাথা নীচু করল।

রায়বাহাদুর আবার বললেন,—আমি অকৃতদার, ভেবেছিলাম আমার যা কিছু ইভাকেই দিয়ে যাব। ইভা আমার বন্ধুকন্যা। পিতৃহীন বন্ধুকন্যাকে আমি যথেষ্টই স্নেহ করতাম। আপন বলতে আমার তো কেউ নেই। কিন্তু ভগবানের বুঝি বা তা ইচ্ছা নয়, তা না হলে আমাকেই বা এ বয়সে এ শোক পেতে হবে কেন?

রায়বাহাদুরের কথার মাঝেই বিজয় এসে উপস্থিত হল।

—চল বিজয়।

উঠে পড়লেন রায়বাহাদুর।

—কখন ফিরছ দাদা?

—এই একুণি ফিরব।

যেতে যেতেই বিজয় শ্যামলীর কথার উত্তর দিল। শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারল না সে।

বিজয় ও রায়বাহাদুর গাড়ীতে গিয়ে বসল।

নয়—

গাড়ী চলতে লাগল।

রায়বাহাদুর বিজয়ের সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তাই বলতে লাগলেন। ইভার প্রসঙ্গে কোন কথা তিনি উল্লেখ করলেন না। বিজয়ও কিছু বলল না।

সোনারপুরের পথে এ্যাক্‌সেল ভাঙ্গা লরীর কাছে রায় বাহাদুরের গাড়ী এসে পৌঁছল।

ইতিমধ্যে অন্য একটি লরী এসে গিয়েছিল; তাতে চালের বস্তাগুলো তোলা হচ্ছিল।

চালগুলো সব বোঝাই দেওয়া হয়ে গেলে বিজয় বলল,—আমিও এই লরীর সঙ্গে সোনারপুর যাচ্ছি।

—না, তোমার আর এখন গিয়ে কাজ নেই। বেলা হয়েছে, বাড়ী ফিরে যাও। তোমার বোন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বিজয় আর কিছু না বলে রায় বাহাদুরের পেছনে পেছনে গাড়ীতে এসে বসল।

ফেরবার পথে রায়বাহাদুর হঠাৎ বললেন,—ইভা আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছিল, কাগজ দেখে সেটা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। কিন্তু দুর্দৈব, চোরের ওপর হল বাটপাড়ি। বুদ্ধির খেলায় তুমি হলে জয়ী।

—আমি নয়, আপনি। আপনি যে সবার চাইতে বেশী বুদ্ধি রাখেন, তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে, স্যার ?

—কি করে ?

—ইভা টাকাও পেল না, সঙ্গে ঘুষ দিল তার প্রাণটা।

—দেখ বিজয়, তোমার এই বাঁকা বাঁকা কথাগুলো আমার বরদাস্ত হয় না। পোষ্ট-মর্টম রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ বলে যা বলেছে, তার পরেও কি তুমি ভাবছ ইভাকে হত্যা করা হয়েছে ? আর তাকে হত্যা করা হয়েছে বলেই যদি তুমি নিশ্চয় জেনে থাক, তবে সে হত্যাকারী তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

—স্যার, ইভার মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চেষ্টা করবেন না। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা।

—সেদিন তোমাকেই তার হত্যাকারী বলে আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ময়না তদন্তের পর সে ধারণা আমার বদলিয়েছে। টাকার শোকই ইভার মৃত্যুর কারণ। যে হাঁস সোনার ডিম দেয়, বেশী লোভে তাকে হত্যা করে ইভা একযোগে সে সম্পদ লাভ করল, তুমি সেই সম্পদ অপহরণ করলে। সর্বদিক খুইয়ে অত্যধিক মানসিক বিপর্যয় ঘটল ইভার, যার ফলে 'ব্রেন প্যারালিসিস্' রোগে তার মৃত্যু হল।

—মানসিক বিপর্যয় তার ঘটেছিল ঠিকই। তবে তার টাকা আমি নিই নি।

বিজয়ের কথা শুনে রায়বাহাদুর অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

বললেন,—একমাত্র তুমিই জানতে পেরেছিলে, ইভার কাছে ত্রিশ হাজার টাকা আছে। সেই রাত্রিতেই ইভার মৃত্যু হল, কিন্তু পুলিশ আজ পর্যন্তও টাকা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেনি। তাতেই বোঝা যায়, টাকার কথা পুলিশ জানতে পারেনি। সেই রাত্রেই সে টাকা খোয়া গিয়েছে, না হলে তার ঘরেই ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যেত। এর পরেও কি তুমি বলতে চাও, তুমি টাকা নাও নি?

—টাকাটা তো আপনিও নিতে পারেন? কিন্তু স্যার, সব যখন মিটে গেছে—এ অপ্রীতিকর আলোচনা বন্ধ থাক। আব্দুল গাড়ীটা একটু রাখ, আমি এখানেই নেবে যাব।

রাস্তার পাশে গাড়ী দাঁড় করাল আব্দুল।

বিজয় বলল,—আমার বাড়ী এখান থেকে কাছেই; আমি এখানেই নেমে যাই স্যার।

—আচ্ছা।

গাড়ী থেকে নেমে গেল বিজয়।

রায়বাহাদুরের চোখে মুখে ফুটে উঠল, প্রতিহিংসা। মনে মনে বললেন, তোমার দিনও শেষ হয়ে এসেছে বিজয়।

পরমুহূর্তেই শ্যামলীর শান্ত মুখচ্ছবি, কালোনিবিড় পক্ষপুটের বন্ধনীতে টল টলে দুটো চোখ, যৌবন-লাবণ্যে

তরঙ্গায়িত পরিপুষ্ট দেহ ঘিরে শাড়ীর আবরণ সমুন্নত বক্ষের ওপর ঈষৎ কম্পমান;—এ ছবি সকাল বেলা বিজয়ের বাড়ীতে দেখবার পর, রায়বাহাদুরের মনে আবার এসে তা উদয় হল। তাঁর মনেও যেন কাঁপন লাগল। চোখ দুটো তাঁর জ্বলে উঠল, এক পৈশাচিক কল্পনায়।

দশ—

সেদিনের সে ঘটনার পর শ্যামলী বিজয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধই করেছে। যেটুকু কথা না বললে নয় —তাছাড়া অন্য কোন কথা নিজে তো বলেই না, বিজয়কেও তার কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ দেয় না। বিজয় তার মিথ্যা ভাষণের একটা লাগসই কৈফিয়ৎ ঠিক করে রেখেছিল। শ্যামলীকে সে কথা বলতেই, শ্যামলী অন্য কাজের অছিলায় উঠে গেল।

ভাই-বোনের মধ্যে এই অস্বস্তিকর অবস্থার মীমাংসা আজই করবে বলে বিজয় স্থির করল।

দুপুর বেলা খেতে বসে বিজয় শ্যামলীকে বলল,—আমি তোর বড় ভাই, অথচ কদিন থেকে তুই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিস যে, আমি তোর কেউই নই।

—আমি কিছু করছিনা, যা করবার তুমিই করছ। শুধু শুধু কতকগুলো মিথ্যে কথা বলার হাত থেকে তোমাকে রেহাই দিয়েছি।

—ও, আমি বুঝি শুধু মিথ্যেই বলি।

—মিথ্যে বল, কি সত্যি বল সেটা তুমিই জান। তবে তোমার এ পরিবর্তন খুব বেশীদিন হয়নি দাদা?

—আমার পরিবর্তন হয়েছে,—তা ঠিক—তবে তোর কাছে

যে মিথ্যে বলেছিলাম, সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। সমস্ত জগতটাই বদলে গেছে,—আমার পরিবর্তন হবে, তা আর বেশী কি? তুই তো কলেজে পড়ছিস,—দেখতে পাস্ না আজকের জগতের চেহারা? তুই যতটুকু বুঝতে বা জানতে পারিস—বাইরের জগতের চেহারা তার চাইতেও অনেক বেশী আলাদা।

—বাইরের খবরে আমার দরকার নেই,—তুমি কেন মিথ্যে বলবে? যা সবাই—তুমিও কি তাই হবে? আর আমার কাছে মিথ্যে বলবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল?

—বললাম তো, মিথ্যে বলব বলে মিথ্যে বলিনি। ওটা অভ্যাসের দোষ।

একটু থেমে আবার বিজয় বলতে আরম্ভ করল,—শ্যামলী, আদর্শ আমার ছিল অনেক বড়—তাই আঘাতটাও পেয়েছি বেশী। লেখাপড়া শিখে একটা ভণ্ড, জালিয়াত ব্যবসাদারের তোষামোদী করছি—এটা আমার গর্বের কিছু নয়। কিন্তু এছাড়া উপায়ও তো কিছু নেই। আদর্শ বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে পদে পদে ঠোক্কর খেয়ে নিজেকে গড়ে নিলাম চলতি ছাঁচে। আজকের পৃথিবীর রূপ যে আলাদা। একটু ভালভাবে মানুষের মত থাকতে গেলেও যে টাকার দরকার—সৎপথে, আদর্শ বাঁচিয়ে আজ তা আর কেউ রোজগার করতে পারে না। বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন দেনা করে,—হায়রে অন্ধ পিতা! বাবা ভেবেছিলেন, আমি একটা জজ-ব্যারিষ্টার হব—হাজার হাজার

টাকা উপায় করব—কত মিথ্যা আশা! গরীবের ছেলেরা জজ-ব্যারিষ্টার আগে হত,—এখন হয় না। এখন স্কলার-সিপের টাকাগুলোও পায়—যাদের টাকা না পেলেও কোন ক্ষতি হত না—তারাই। বাবা আমার জন্যে টাকা খরচ না করে—যদি টাকাগুলো রেখে দিতে পারতেন—তাতে আমার সুবিধা হত বেশী। দু'একটা গরীবের ছেলের ভাগ্যে সুযোগ যে না আসে, তা নয়। কোন বড়লোকের নজরে পড়লে—তাকে কিনে নিতে চায়, নিজের দুলারী মেয়ের পোষা কুকুরের সখ মেটাতে। যে সব গরীবের ছেলেরা সোনার শিকল গলায় পরে—তারা শ্বশুরের দরুণ সুযোগ-সুবিধা পায়, জজ-ব্যারিষ্টারও হয়। কিন্তু আমি যে তাও পারলাম না। ঐ যে বললাম, আদর্শ ছিল আমার অনেক বড়, তাই কিছুই হল না।

—সীমাদি কিন্তু বড়লোকের দুলারী মেয়ে ছিল না। তাকে বিয়ে করলে তুমি ঠকতে না দাদা। সীমাদি তো আজও বিয়ে করল না।

—তার বাবা তো মেয়ের জন্যই আমাকে কিনতে চেয়েছিল? সীমাদি তোর যত ভালই হোক—তার বাবার টাকায় ও প্রভাবে সুযোগ করে নেবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না। মুখে স্বীকার না করলেই—সত্যি তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না। যাক্—সে কথা, সে মন আমার হারিয়ে ফেলেছি অনেকদিন আগে। আজকের আমি আর সেদিনের আমিতে

অনেক তফাৎ। আজ আমার আদর্শ শুধু পয়সা রোজগার করা—তার জন্যে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলা, তোষামোদ করা—সবই করতে আমি প্রস্তুত। এই করে, আর বড়লোকদের নানারকম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আজ বাবার দশ হাজার টাকার দেনা শোধ করেছি। বাবার দেনা শোধ না করতে পারলে, আমাদের এই মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও থাকতনা, দেনার দায়ে নিলাম হয়ে যেত।

একটু থেমে আবার বলল,—আমার জীবন তো নষ্টই হয়ে গেছে, তাই বলে পয়সার অভাবে তুই যে কোন সুযোগ সুবিধা পাবি না, তা আমি হতে দেব না। যতদূর তুই পড়তে চাস, আমি পড়াব। বিয়েও তোর যে সে ঘরে হতে দেব না। পয়সায় আসে সুযোগ, প্রতিষ্ঠা, সম্মান। পয়সা উপায়ই আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য। তবে এটুকু বিশ্বাস করিস শ্যামলী, একটু মিথ্যে কথা বা তোষামোদ ছাড়া বড় অন্যায় কিছু আমি করিনি বা করব না। আমি যা করি, আজকের যুগে তাকে আর অন্যায় বলে না।

—কি ন্যায় আর কি অন্যায়—তা বলতে পারি না। ন্যায় অন্যায়ের বিচারও আমি করতে বসিনি। তবে, আমার এসব কিছু ভাল লাগে না।

—তুই এসব নিয়ে ভাবিস কেন বলত? ভাল করে পড়া-শোনা কর—ব্যস এই তোর কাজ। আজ আবার

আমায় ব্যাঙ্কে যেতে হবে। বেলা ছুটোয় কাউন্টার বন্ধ হয়। আমি উঠলাম।

আসন ছেড়ে বিজয় উঠে পড়ল।

বিজয়ের কথাগুলো শ্যামলীর মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। পিতৃঋণ পরিশোধ করতে বিজয়কে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিজয় তার কার্যের স্বপক্ষে যত বড় যুক্তিই দেখাক, শ্যামলী কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না নিজের মনে। একটা ফাঁপা খোলসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এ মর্যাদার কি মূল্য আছে? বিজয় যদি পিতৃঋণ পরিশোধ নাই বা করতে পারত, তাতে এমন কি ক্ষতি হত? না হয়, তারা ভাড়া বাড়ীতে বাস করত। একটা অন্যায়কে মেটাতে গিয়ে, অন্য একটা অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়াতে কি এমন পুণ্য আছে?—শ্যামলী নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল।

বিজয় ভাল করেছে কি মন্দ করেছে—কিছুই তার কাছে স্পষ্ট হয় না। তবুও একটা অস্বস্তির ভাব মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল—বিজয় এখনও ফিরল না। শ্যামলী একটু উদ্বিগ্ন

হয়ে উঠল। বিজয় যে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে এমন কোন কথা ছিল না; আর আজকাল বিজয়ের ফিরতে তো প্রায়ই রাত হয়। তবুও বিজয়ের জন্য অহেতুক উৎকণ্ঠা আজ কেন যেন শ্যামলীকে পীড়িত করছে। অমঙ্গলের আভাস বুঝি বা এমনি করেই প্রিয়জনের মনকে নাড়া দেয়!

দরজার কড়া নড়ে উঠতেই বুধীর মা গিয়ে দরজা খুলে দিল।

বিজয় আসেনি; এসেছেন রায়বাহাদুর স্বয়ং—দুঃসংবাদ বহন করে।

রায়বাহাদুর যা বললেন—শ্যামলী চুপ করে সমস্ত শুনল। কোন প্রশ্ন সে করল না।

রায়বাহাদুর তাঁর বক্তব্য শেষ করে বললেন,—বিজয় যে এমন করবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। যদি জানতাম টাকাটা বিজয় নিয়েছে, তবে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিতাম না। পুলিশ যখন সবাইকে তল্লাসী করে বিজয়ের পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করল—আমি তো হতভম্ব। পুলিশ চুরি ধরেছে, আমার হাতের বাইরে চলে গেছে তখন সমস্ত ব্যাপারটা; পুলিশ বিজয়কে নিয়ে গেল। বিজয়কে আমি খুবই বিশ্বাস করতাম। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেওয়া-দেওয়া

বিজয়ই করত। আমার স্নেহের সুযোগ যে বিজয় এমনভাবে অপব্যবহার করবে—তা কখনও ভাবিনি। ছেলেমানুষ! চাইলেই তো আমি তাকে দিতাম টাকা! এর আগেও তো কত দিয়েছি। শুধু শুধু তার ঐ দুর্বুদ্ধি কেন হল? যাই হোক—তুমি কিছু ভেব না শ্যামলী, বিজয়ের যাতে সাজা কম হয়, আমি তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ছেলেমানুষ একটা ভুল করে ফেলেছে বই ত নয়?

এতক্ষণে শ্যামলী কথা বলল,—শাস্তি দিয়েছেন ভগবান, অন্যায়ের সাজা পেতেই হয়। আগুনে পুড়ে সোনা খাঁটি হয়। শাস্তি তাঁর পাওনা হয়েছিল—এ ভগবানের বিধান। আপনি কোন চেষ্টা করবেন না।

—তোমার এ মনোভাবকে আমি প্রশংসা করি শ্যামলী। তবুও বিজয় তোমার সহোদর, তাকে তুমি ক্ষমা কর।

—আপনি মহানুভব, দাদাকে এখনও তাই স্নেহ করেন। আমি তো দাদার ওপর রাগ করিনি যে, তাঁকে ক্ষমা করব। যা ন্যায় তা চিরদিনই ন্যায়—আর অন্যায় চিরদিনই অন্যায়। দাদা এবার সেটা হয়ত বুঝবেন!

—তবুও বিজয়ের শাস্তি হলে, আমি নিজেকে অপরাধী মনে করব। যত তাড়াতাড়ি পারি, তাকে আমি ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করব। তুমি আমাকে তোমাদের পরিবারের বন্ধু বলেই মনে ক'র শ্যামলী। বিজয়ের অনুপস্থিতির কারণে

তোমার যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তা আমি দেখব। আচ্ছা, আজ চলি, কাল আবার আসব।

রায়বাহাদুর চলে গেলেন।

রায়বাহাদুর যে সংবাদ বহন করে এনেছিলেন তা হচ্ছে—সেদিন রায়বাহাদুরের পঞ্চাশ হাজার টাকার একখানা চেক বিজয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসে। টাকাটা রায়বাহাদুরকে দিয়ে, নীচে অফিস-ঘরে বসে বিজয় কাজ করতে আরম্ভ করে। যে লোকটিকে দেবার জন্যে টাকাটা আনা হয়েছিল, ঘণ্টাখানেক পরে লোকটি রায়-বাহাদুরের কাছে টাকা নিতে আসে। রায়বাহাদুর তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে টাকা রেখেছিলেন, অথচ সেখানে টাকা পাওয়া গেল না। টাকাটা রাখবার পর রায়বাহাদুর একবার মাত্র ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন সামান্যক্ষণের জন্যে—ফিরে এসে অবশ্য তিনি ড্রয়ার খুলে দেখেন নি, টাকা আছে কি না। কেননা, তাঁর কোন সন্দেহই হয় নি। এরকম তিনি বরাবরই টাকা রেখে থাকেন, জরুরী কোন দরকার থাকলে।

টাকা না পেয়ে রায়বাহাদুর দারোয়ানকে হুকুম দিলেন গেট বন্ধ করে দিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে ফোন করে দিলেন।

পুলিশ এসে বাড়ীর চাকর বাকর সবাইকে তল্লাসী করল,

কিন্তু কারো কাছেই টাকা পাওয়া গেল না। শেষে অফিস কক্ষে হ্যাঙ্গারে যে কোট ঝুলছিল, তার পকেটে থেকে টাকা পাওয়া গেল। হ্যাঙ্গারে কোট ঝুলিয়ে রেখে, বিজয় কাজ করছিল।

অফিসকক্ষে একবার মাত্র বাড়ীর ঝি মালতী ঢুকেছিল বিজয়কে চা দিতে। সে টাকাটা চুরি করে বিজয়ের কোটের পকেটে রেখে দিতে পারত। কিন্তু মালতী যখন বিজয়কে চা দিতে আসে তার আগেই রায়বাহাদুরকে সে চা দিয়ে এসেছে, রায়বাহাদুর তখনও ঘর থেকে বাইরে যান নি। তার অনেক পরে রায়বাহাদুর একবার বাইরে গিয়েছিলেন মাত্র। সুতরাং মালতীর চুরি করা সম্বন্ধে কোন কথা টেকে না।

এগারো—

বিনিদ্র রজনী কাটল শ্যামলীর।

সারারাত ধরে সে ভেবেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে তার। দাদার জন্যে সে দুঃখ পায়। তার জন্যেই দাদা অন্যায় পথে অর্থোপার্জন করতে দ্বিধা করেনি। দাদা তাকে এত ভালবাসে! বাবার ঋণ শোধ করতে দাদা ন্যায় অন্যায় বিচার করেনি। নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য দাদা কিছুই করে নি। না আছে তার কোন বিলাসিতা বা সখ। কিন্তু দাদা কেন বোঝে না, অন্যায় পথে কোন স্থায়ী লাভ হয় না। আজ যে লাঞ্ছনা, অন্যায়ের শাস্তি তাকে বরণ করে নিতে হল;—ভগবানের বিধানে সে রেহাই পাবে না, তা সে যত ভাল উদ্দেশ্যই হোক না কেন তার অন্যায় পন্থার। দাদার জন্যে সহানুভূতি, সমবেদনায় শ্যামলীর অন্তর ব্যথিত হয়ে ওঠে।

শ্যামলী আজ আর কলেজ গেল না। শরীর খারাপ বলে, ঘরেই শুয়ে-বসে কাটাল।

বিকেলের দিকে রায়বাহাদুর এলেন।

বললেন,—বিজয়ের সঙ্গে দেখা করে এলাম। জামীন দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বিজয় জামীনে মুক্তি পেতে

রাজী হল না। সে বড়ই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছে। আমার সঙ্গেই দেখা করতে চাইছিল না। তুমি যদি বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাও—কাল এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কালই আদালতে মামলা উঠবে।

—না, আমি যাব না। আমাকে দেখলে দাদা বড় বেশী লজ্জা পাবেন।

—হ্যাঁ, বিজয় ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে সে বদ্ধপরিকর। কারো সাথেই সে দেখা করতে চায় না। আমাকে শুধু একবার বলল, শ্যামলীকে একটু দেখবেন। ভাই-বোন তোমরা পাগল। ভুল কি কেউ করে না? আমিই কি ভুল করিনি—তাই বলে শাস্তি পাবার জন্যে এত জেদ করে লাভ কি? অবশ্য আইনের শক্তি তার ওপর প্রয়োগ হবেই। তবুও চেষ্টা করলে, শাস্তিটা হয়ত কিছু কম হত।

—দাদার যথেষ্ট আত্মগ্লানি হয়েছে—আত্মগ্লানিতেই প্রায়শ্চিত্ত। যদি সম্ভব হয়, তবে শাস্তিটা যাতে লঘু হয়, দয়া করে আপনি একটু চেষ্টা করবেন।

—আমি কি আর তার চেষ্টা করছি না, না ভাই-বোনের পাগলামিতে চুপ করে বসে আছি? দেখি কাল কি হয়! আচ্ছা, আমি চলি। আর হ্যাঁ, একলা তোমাদের এ বাড়ীতে হয়ত ভয় করতে পারে ভেবে, আমি একজন নেপালী দারোয়ান ঠিক করেছি—সে আজ রাত থেকে এখানে থাকবে। তাকে

দিয়েই বাজার-হাট করিয়ে নিও। সব সময়েই সে এখানে থাকবে, খুব বিশ্বাসী লোক।

—আপনি আমাদের জন্যে যথেষ্টই করছেন।

—কি যে, বল! বিজয়ের এ ব্যাপারে আমি নিজেকেই সব সময় অপরাধী মনে করছি। আচ্ছা, আমি গিয়েই দারোয়ানকে পাঠিয়ে দেব। দরজার পাশে একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকবে সে।

—আমাদের হাতেই তো খাবে, না নিজে রান্না করে নেবে?

ওর খাওয়া-দাওয়ার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। ও নিজেই ওর সব ব্যবস্থা করে নেবে। আচ্ছা, আমি চলি।

রায়বাহাদুর তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যে সরল বিশ্বাসী মেয়ে শ্যামলীকে মুগ্ধ করে চলে গেলেন।

বারো—

বিজয়ের এক বৎসরের জেল হওয়ার সংবাদ নিয়ে রায়বাহাদুর পরদিন আবার এলেন।

শ্যামলী শুনল। শ্যামলী জানত—বিজয়ের জেল হবে, তবে এক বৎসরের জেল,—শাস্তিটা বড় বেশী মনে হল তার।

শ্যামলী খবরটা শুনে মুখ নীচু করে শুধু বলল,—দাদা কিছু বলছিলেন ?

—না, বিশেষ কিছু নয়। এই তোমাকে দেখাশোনার জন্যে আমাকে অনুরোধ করছিল। আর বলছিল, তার অপকার্যের জন্যে তোমাকে সে দুঃখ দিয়েছে। তোমার কাছে সে নাকি মুখ দেখাতেও পারবে না। হ্যাঁ, কাল দরওয়ান এখানে ছিল ? তোমরা কোন অসুবিধা বোধ করনি তো ?

—অসুবিধা আর কি—।

নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল শ্যামলী।

রায়বাহাদুর বুঝলেন, শ্যামলীর মন বইছে এখন অন্য খাতে। তিনি বললেন,—বিজয়টা বুঝল না, তার জেদ করে এই শাস্তি গ্রহণ করাতে আমরাও যে তার সঙ্গে শাস্তি পাচ্ছি। তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পর জেলের মেয়াদ আর কমানো গেল না। কি করব বল !—ইভা, বিজয় এরা সবাই আমার

পূর্বজন্মের নিশ্চয়ই শত্রু ছিল—তাই এখনও আমায় শাস্তি দিতে কসুর করছে না।

রায়বাহাদুর একটু চুপ করলেন,—শ্যামলী কিন্তু কোন কথাই বলল না।

রায়বাহাদুর পকেট থেকে দশটাকার পাঁচখানা নোট বের করে বললেন,—তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয়, বিজয় বার বার সেই কথাই বলছিল। বিজয় বলবে, তারপর আমি তোমাদের দেখব—পাগল আর কি! এ যে আমার কর্তব্য। এই নাও, আপাততঃ খরচ পত্রের জন্যে এই টাকাটা রাখ।

শ্যামলী ইতস্ততঃ করতে লাগল—রায়বাহাদুরের হাত থেকে টাকাটা গ্রহণ করতে।

—না না, 'কিন্তু' কর না,—নাও ধর টাকাটা।

রায়বাহাদুর একরকম জোর করেই শ্যামলীর হাতে টাকাটা গুঁজে দিলেন।

—আমাকে লজ্জা কর না। আমি রোজই এসে একবার করে খবর নিয়ে যাব। যদি কখনও বিশেষ দরকার হয়, দরওয়ানকে দিয়ে আমাকে একটা খবর পাঠিয়ে দিও।

শ্যামলী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

রায়বাহাদুর সেদিনের মত চলে গেলেন।

তেরো—

পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে তলব পেয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানার ও. সি. লালবাজারে এসে পৌছল।

ও. সি. পুলিশ কমিশনারের ঘরে ঢুকে বলল,—গুডমর্ণিং স্যার।

পাইপ দাঁতে চেপে ফাইলের দিকে চোখ রেখেই কমিশনার উত্তর দিলেন,—মর্ণিং। বসুন।

ও. সি. আসন গ্রহণ করল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে, একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পুলিশ কমিশনার বললেন,—ইভা চৌধুরীর কেসের ওপর আপনার রিপোর্ট আমি দেখেছি। আপনি কেসটা ফলো আপ করতে চান? কোন ক্লু পেয়েছেন কি?

—আজ্ঞে না, সঠিক কোন সিদ্ধান্ত আমি এখনও করতে পারিনি; তবে আমার মনে হয় ইভাদেবীর মৃত্যুর পেছনে কোন সুচতুর লোকের হাত রয়েছে। এমন সুকৌশলে তাকে হত্যা করা হয়েছে যে, ময়না তদন্তেও মৃত্যুর কারণ এক অদ্ভুত রোগ ছাড়া অন্য কিছুই নয় বলে প্রমাণিত হল।

—হুঁ, আপনি যেমন অনুসন্ধান করছেন, করুন। এদিকে এ কেসটা সম্বন্ধে আমি সেণ্ট্রাল থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। খবরের কাগজ মারফৎ ইভাদেবীর মৃত্যুখবর ও বিশেষ

করে এই অদ্ভুত রোগে মৃত্যু—অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। একজন জার্মান ডিটেকটিভ স্বেচ্ছায় এ কেস গ্রহণ করবার ইচ্ছা জানিয়ে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। জার্মান ডিটেকটিভ মিঃ ষ্টল্‌বা এই সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতা এসে পৌঁছুচ্ছে। এই দেখুন চিঠি।

পুলিশ কমিশনার একটা ফাইল এগিয়ে দিল তার দিকে।

ও. সি. ফাইল থেকে চিঠিটা পড়ে বলল,—বেশ মিঃ ষ্টল্‌বাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

—ইভাদেবীর বাড়ীটা এখন কি অবস্থায় আছে?

—ওখানে গার্ড রয়েছে। মিস চৌধুরীর জিনিষপত্র সবই সেখানে রয়েছে।

—কোন ওয়ারীশ নেই নাকি?

—এখন পর্যন্তও তো জানা যায়নি।

—ভাড়া বাড়ী ছিল তো ওটা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পরশু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন একবার মিঃ ষ্টল্‌বা কবে ও কখন এসে পৌঁছুচ্ছেন সঠিক জেনে যাবেন আচ্ছা, এবার আপনি আসুন।

পুলিশ কমিশনার ঝুঁকে পড়ে কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন।

ও. সি. ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চৌদ্দ—

কদিন পর।

ডাক্তার বোসের চেম্বারে বসে রামতারণবাবু ও ডাক্তার বোস কথা বলছিলেন।

—তা হলে আমার কথাই ঠিক হল ডাক্তার?

—কি কথা?

—কেন, বলেছিলাম না, এর মধ্যে 'কিন্তু' আছে। তাই যদি না থাকবে, জার্মান ডিটেকটিভ হঠাৎ এ ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবে কেন? তুমি তো থানায় গিয়েছিলে,—কেমন দেখলে সাহেব ব্যাটাকে?

—রংটাই সাহেবী, কিন্তু চমৎকার বাংলা বলতে পারে। শুনলাম,—জার্মান, ইংলিশ, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, বাংলা—এরকম আঠারোটা ভাষা জানে লোকটা। এর আগেও নাকি এদেশে অনেকদিন ছিল। দেখলাম সবার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলছে;—সাহেবী বাংলা নয়, বেশ ভাল বাংলা।

—তাহলে লোকটা গুণী হে ডাক্তার। বয়স কত?

—সাহেবদের বয়স চেহারা দেখে বোঝা মুস্কিল। মুখে দাড়ীগুলো পাকা,—অথচ বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স পঞ্চাশও হতে পারে, আবার সত্তর হওয়াও আশ্চর্য নয়।

—তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করল?

—বিশেষ কিছুই নয়। ইভাদেবী সম্বন্ধে সাধারণ দু'একটা কথা।

—আচ্ছা ডাক্তার, এত কাণ্ড যে হচ্ছে, লাশ কাটাকাটি করেও যার কোন হদিস কিছু হল না—শেষে বলল কিনা রোগে মরেছে, তোমার কি মনে হয় বলত?

—ময়না তদন্ত করে বলেছে—রোগে মরেছে—সে কথা তো মিথ্যা হতে পারে না। এখন ওরা জানতে চায়, মৃত্যুর দিন ইভাদেবী চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন কেন?

—রায়বাহাদুর কি বলে?

—তিনি তো প্রথম থেকেই বলছেন, চাকরী ত্যাগ করার কোন কারণ ইভাদেবী নাকি প্রকাশ করেন নি।

—দেখা যাক্ সাহেব ব্যাটা যদি কিছু বের করতে পারে?

—হ্যাঁ! সাহেব ব্যাটা তো সব করবে? ওসব নাম প্রচার করবার বুজরুকি। যদি ইভাদেবীর চাকরি ত্যাগ করার কোন গূঢ় কারণ থাকেই বা, তার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ নেই। আর যে ক্ষেত্রে ময়না তদন্তে প্রকাশ হয়েছে যে, ব্রেণ প্যারালিসিস হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে,—তখন জার্মান ডিটেকটিভের কি করবার আছে? এ আইনের কথা।

—আইনের কথা?

—নয় তো কি? রোগে মরল রুগী—তা সে রোগ

মানসিক বিপর্যয়ের কারণেই ঘটুক, আর যে কারণেই ঘটুক —এতে ডিটেকটিভ কি করবে ?

—ধর, যদি কেউ তাকে এমন কোন মানসিক আঘাত দিয়ে থাকে যার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে—তবে যে দোষী তার শাস্তি হবে না ?

—কে প্রমাণ করবে যে শুধু সেই মানসিক আঘাতই তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ ?

—কি জানি ডাক্তার। ওসব কথা যেতে দাও। আমি মরছি নিজের জ্বালায়—

—কেন আপনার আবার কি হল ?

—কি না হল তাই বল। বিয়ে করে আনলাম গরীবের মেয়েকে—কোথায় কৃতজ্ঞ থাকবে—তা না আমাকে লেকচার শোনায়। হিন্দুর ঘরের বউ, স্বামীর প্রতি তার ভক্তিশ্রদ্ধা থাকবে না, এ কি রকম ? আমি বিয়ে করেছি না ছুঁচো গিলেছি। এ সব ইন্দুর শিক্ষা—বুঝলে হে ডাক্তার ? যেমন ভাই, তেমনি তার বোন।

—কেন, কি বলেন বৌদি ?

—বলে,—বলে আমি নাকি স্বার্থপর ; বিয়ে করে অন্যায় করেছি। হিতোপদেশ শোনায় আমাকে। শুধু হিতোপদেশ, কথার তার ঝাল কত ? তোমাকে কি বলব ডাক্তার, তার কাছে ঘেঁষলে নাকি আত্মহত্যা করবে। বলত ডাক্তার, এখন কি করি ?

—গয়না গড়িয়ে দিন, ভাল ভাল শাড়ি দিন,—দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। প্রথম উনি যা বলেন, তাই শুনবেন—দেখবেন বৌদি আপনিই ধরা দেবেন।

—তুমি তো কালকের ছোক্‌রা হে ডাক্তার,—বশ করা শেখাচ্ছ আমাকে? ওসব কি আর আমি জানিনে? কিন্তু ওসব বিদ্যেতে আর কুলোচ্ছে না ডাক্তার—আজকালকার সবই কেমন যেন বিদঘুটে। মেয়ে মানুষ শাড়ি গয়নায় ভোলে না,—সৎ ছেলে মেয়ের কথায় ওঠে বসে—এ সব শুনেছো কখনও? তোমার বিদ্যে আগেই প্রয়োগ করেছি—কিন্তু ওতে উল্‌টো বিপত্তি হয়েছে। আসলে কাল হয়েছে আমার নেকাপড়া জানা মেয়ে ইন্দু পোড়ামুখী। বাউণ্ডুলে ভাই যেমন, বোনও হয়েছে তার জুড়ী। উপায় করতে হয় না, তাই বাপের ঘাড়ে বসে হাটে মাঠে লেকচার দেওয়া আর যতসব ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে দিনরাত হুই হুল্লোড় করতে লজ্জা করে না দামড়া ছেলের। ইন্দুও আজকাল জুড়েছে ভাইএর সঙ্গে। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় ছোটলোক মেয়েদের সাথে। ঐসব দেখে আর যতসব অন্তঃসারশূন্য ছাইপাঁশ কথা শুনে, নূতন বউয়ের মেজাজও গেছে বিগড়ে। ছেলে মেয়ে দুটোই আমার সংসার ছারখারে দিল। ও দুটোই আমার কাল হয়েছে।

—মেয়ের একটা বিয়ে দিয়ে বিদায় করুন; আর ছেলের জন্যেও একটা বউ ঘরে আনুন—ব্যস্ তা হলেই

বাজীমাৎ। ওসব দেশোদ্ধারের নেশা ওদের আপনিই কেটে যাবে।

—মেয়ের বিয়ে দেব? ও মেয়েকে বিয়ে করবে কে, শুনি? রোদে রোদে ঘুরে দিন দিন পেত্নীর মত চেহারা হচ্চে। আর বিয়ে করবার দরকারটা কি ওদের? কি বলে, না 'কমরেড'! যত সব—! জোয়ান জোয়ান ছেলেমেয়ের একসঙ্গে অবাধ মেলা-মেশা—এ সবের মানে বোঝ না? ওদের টান যে কোন্‌খানে তা আমি বুঝি ডাক্তার, সব বুঝেও বাপ হয়ে চুপ করে সহ্য করতে হয়। কলিকাল আর কাকে বলে? ঘোর কলি—পাপে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডাঃ জয়ন্ত বোস রামতারণবাবুর মনোবেদনার সহানুভূতির বদলে হেসে ফেলল।

রামতারণবাবু চটে গেলেন।

—তুমি তো হাসবেই। ঢুকু ঢুকু জল যে তুমিও খাও, তা আমি জানি ডাক্তার। তা না হলে, ইভার সঙ্গে তোমার এত ভাব ছিল কিসের—ওসব বুঝি ডাক্তার। মাগী মরেছে, না, পাড়া ঠাণ্ডা হয়েছে। পাড়ার ছোঁড়ারা রাতদিন চুলবুল করে বেড়াত ঐ মাগীর বাড়ীর আশে পাশে।

—তাতে কিন্তু একটা সুবিধা ছিল রামতারণবাবু, পাড়ায় নূতন অশান্তি কিছু ঘটতে পায়নি। যাক্ সে কথা, আপনি শুধু শুধু চটছেন। আমি হেসেছি বৌদির নির্বুদ্ধিতার কথা শুনে।

—হুঁ।

রামতারণবাবু চটেছিলেন খুবই। ডাঃ বোসের কৈফিয়তের পরও 'হুঁ' ছাড়া আর কিছু বললেন না।

—যাই, বেলা হল।

রামতারণবাবু উঠে পড়লেন।

ইভাকে না পেলেও সহধর্মিণীর শূন্য আসন পূর্ণ করতে রামতারণবাবুর দেরি হয় নি। রামতারণবাবুর তৃতীয় পক্ষ অলঙ্কৃত করেছে রাণাঘাটের এক গরীব ব্রাহ্মণের কন্যা কমলা।

তবে আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো সব কেমন ধারা। কথা বলে সব ওলোট-পালোট, খানিকটা লেখাপড়া জানা তৃতীয়-পক্ষ কমলার ধরণ-ধারণ রামতারণবাবুর বিশেষ মনঃপূত নয়, অথচ মুখে গৃহিণীকে কিছু বলতেও পারেন না। স্পষ্ট করে উল্লেখ করবার মত দোষ যে কিছু তিনি খুঁজে না পান, তা নয়, তবে সে নিয়ে কিছু বলতে গেলে উলটো বিপত্তি হবে। তাঁর কলেজে গড়া মেয়ে ইন্দ্রাণীর বিশেষ অনুগত কমলা। মা-মেয়ের সম্বন্ধ তাদের মধ্যে নেই, বয়স ও ব্যবহারে তারা যেন দুই বন্ধু। কমলাকে বিয়ে করাতে ছেলে শঙ্কর ও মেয়ে ইন্দ্রাণী অসন্তুষ্ট হয়েছে কিনা বোঝা যায় না। বাপকে ভাইবোন চিরদিনই এড়িয়ে চলে; ইদানীং সেটা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। শঙ্করকে তো বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতে পাওয়াই যায় না। সে আছে তার কাজ, পার্টি, মিটিং এই সব নিয়ে। ইন্দ্রাণীর চলা-ফেরাতেও আজকাল কেমন

যেন একটা ব্যস্ততার ভাব। বাবাকে তারা আমলই দেয় না। তা না দিক, রামতারণবাবুর তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু এতবড় সংসারের দায় সামলানোর জন্যে যাকে ঘরে আনা হল, সেই কমলাও যে ইন্দ্রাণীর অনুগত হয়ে উঠবে এটা রামতারণবাবুর অসহ্য। কিছু বলতেও পারেন না তিনি। মনের জ্বালায় ছট্ পট্ করেন। রামতারণবাবুর এ হয়েছে, কিল খেয়ে কিল চুরী করবার অবস্থা।

পনের—

হোটেলের নৈশ ভোজন এইমাত্র সমাপ্ত হল।

মিঃ ষ্টল্‌বার পরনে একটি কালো স্যুট। বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা টেলিফোন তুলে ম্যানেজারকে চাইল।

—রুম নম্বর ১৪৩, মিঃ ষ্টল্‌বা স্পিকিং।

—ইয়েস স্যার।

—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে ঘণ্টা ছয়েক দেরি হবে। যদি আমাকে কেউ ফোন করে, বলবেন আমি অসুস্থ, ঘুমিয়ে পড়েছি।

—ইয়েস স্যার।

—থ্যাঙ্কস্।

ফোন রেখে দিল মিঃ ষ্টল্‌বা।

গভর্ণমেণ্ট থেকে মিঃ ষ্টলবার গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মিঃ ষ্টল্‌বা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে হোটেলের সদর দরজায় দাঁড়াতে বুটে বুটে ঠেকিয়ে দরওয়ান সেলাম দিল তাকে। মিঃ ষ্টল্‌বা গভর্ণমেণ্টের অতিথি,—তার যোগ্য সমাদর ও অভ্যর্থনা করতে হোটেলের সবাই তৎপর।

—'ট্যাক্সি'।

মিঃ ষ্টল্‌বার মুখ দিয়ে 'ট্যাক্সি' কথাটা বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের 'ট্যাক্সি-কলার' তৎক্ষণাৎ রাস্তায় অপেক্ষমান ট্যাক্সিগুলোর একটাকে বাঁশী বাজিয়ে এনে হাজির করল। 'ট্যাক্সি-কলারের' বংশীধ্বনি শোনবার অপেক্ষায় হোটেলের সম্মুখে সারবন্দী ট্যাক্সির চালকেরা উৎকর্ণ হয়ে থাকে। সারির প্রথমে যে ট্যাক্সি থাকবে—তার দাবীই অগ্রগণ্য। এখানে এই-ই রেওয়াজ।

মিঃ ষ্টল্‌বাকে নিয়ে ট্যাক্সি ছুটল দক্ষিণ দিকে।

রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর মোড়ে এসে মিঃ ষ্টল্‌বা ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

তারপর একটু হেঁটে গিয়ে প্রতাপাদিত্য রোড ধরে এগিয়ে চলল মিঃ ষ্টল্‌বা, রায়বাহাদুরের বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর গেট বন্ধ। গেটের মাথায় লতাকুঞ্জের মধ্যে জ্বলছে ইলেকট্রিক ডুম। মিঃ ষ্টল্‌বা গেট ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে চলল প্রাচীরের গা ঘেঁষে। বাড়ীর পেছন দিকে এসে অন্ধকারটা এক জায়গায় ঘনীভূত হয়েছে—মিঃ ষ্টল্‌বা এদিক ওদিকে তাকিয়ে দ্রুত প্রাচীর টপকিয়ে লাফিয়ে পড়ল রায়বাহাদুরের ফল-ফুলের বাগানের মধ্যে।

ওপরে তখনও রায়বাহাদুরের ঘরে আলো জ্বলছে।

মিঃ ষ্টল্‌বা অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগল। বাড়ীর পেছনে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির দিকে যেতেই

চাকরদের ঘর থেকে অস্পষ্ট চুপি চুপি কথা মিঃ ষ্টল্‌বার কানে গেল।

আস্তে আস্তে চাকরদের ঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল মিঃ ষ্টল্‌বা। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল; কয়েকটা ভাসা ভাসা কিন্তু স্পষ্ট কথা মিঃ ষ্টল্‌বা শুনতে পেল—

—মালতী, চল্‌ আমরা পালিয়ে যাই।

—দূর বোকা, এখন পালাব কিরে? এই তো টাকা কামাই করবার মওকা।

—আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে।

—তুই না মরদ গোবিন্দ? আর তোর ভয় বা কিসের লেগে? টাকা তো তুই কামাই করছিস না,—করছি আমি।

—তাই তো ভয় করে, যদি কোনদিন ধরা পড়ে যাস?

—আমি কি খুন করেছি নাকি যে ভয় করব?

—খুন করিস নি, কিন্তু কাজ তো খারাপ করেছিস। এই যে বিজয়বাবুকে ধরিয়ে দিলি, এ তোর কি পাপ হল না?

—এতে আমার পাপটা কি? মনিব বলল,—বিজয় দাদাবাবুর পকেটে টাকা রেখে দিতে—আমি তাই করনু। মনিবের হুকুম শুনেছি—আমার পাপ কিসে? আর দেখ্‌ গোবিন্দ, বড়লোক মনিবের মন রেখে দুটো পয়সা যদি বেশী কামাই করি তুই অত ভয়ে পুত্‌ পুত্‌ করিস্‌ কেন? চুরি ডাকাতিও করিনি—বেধম্মও করিনি—যে, তুই অত ভয়

দেখাচ্ছিস? নারে, তোকে নিয়ে আমার ঘর করা পোষাবে না,—তুই বড্ড ভীতু রে গোবিন্দ।

—ও কথা বলিস নি মালতী, তোর জন্যেই এখানে পড়ে আছি। তুই যা করিস কর, আমাকে পায়ে ঠেলিস নি।

—তবে কটা দিন চুপ মেরে থাক। কিছু গুছিয়ে নিয়ে তারপর সুবিধে বুঝে একদিন দুজনে সরে পড়ব।

—মা-ল-তী!

—কিরে?

—দেখ্, ই-য়ে মানে বিয়েটা আগে হয়ে গেলে হয় না? এরকম চুপি চুপি ছাই আর ভাল লাগে না।

—অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন,—সব হবে। প্রাণের সখটা একটু দেবে রাখ,—তারপর তো দিন পড়েই আছে। আচ্ছা, আমি এখন যাই,—ঠাকুরের আবার সিনেমা দেখে ফিরবার সময় হল। তুই কিন্তু টাকাগুলো ভালো করে রাখিস্।

—আচ্ছা মালতী, মনিব বিজয়বাবুকে শুধু শুধু জেলে পাঠাল কেন রে? তুই কিছু আন্দাজ করছিস্?

—কি করে বলব? দুদিন যাক্—তখন সব বুঝতে পারব এর মধ্যে কি ব্যাপার! তুই খিল দিয়ে শুয়ে পড়্—আমি চল্লু।

—যাচ্ছিস্?

—হ্যাঁরে এখন যাই, ঠাকুর ব্যাটা আবার এসে পড়বে।

গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

মুচকি হেসে মালতী চলে গেল।

মিঃ ষ্টল্‌বা আস্তে আস্তে জানালার কাছ থেকে সরে এল। ওপরে তাকিয়ে দেখল, রায়বাহাদুরের ঘরের আলো নিভে গেছে।

মিঃ ষ্টল্‌বা একটু ইতস্ততঃ করল, ওপরে যাবে কিনা! শেষে ওপরে যাবার চেষ্টা না করে, প্রাচীর টপকিয়ে বাইরে চলে এল।

তারপর হেঁটে এসে রাসবিহারীর মোড়ে ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা হল মিঃ ষ্টল্‌বা।

ষোল—

পরদিন সকালেই মিঃ ষ্টল্‌বা এসে উপস্থিত হল আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানায়। ও. সি. সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল।

ও. সি.কে জিজ্ঞাসা করল—মিঃ ষ্টল্‌বা, বিজয় বলে কেউ রায়বাহাদুরের বাড়ীতে ছিল ?

—বিজয় চট্টরাজ রায়বাহাদুরের একজন কর্মচারী। ক'দিন আগে ভদ্রলোক রায়বাহাদুরের কিছু টাকা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হন। ভদ্রলোকের এক বৎসরের জেল হয়েছে,—আলিপুর জেলে আছেন।

—আমি চললাম।

—আমি সঙ্গে যাব ?

—নো, থ্যাঙ্কস্।

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিঃ ষ্টল্‌বা বেরিয়ে গেল। ও. সি. তার অপস্রিয়মান গতির দিকে তাকিয়ে, কিছু বুঝতে না পারার ভঙ্গিতে 'শ্রাগ্' করল।

মিঃ ষ্টল্‌বা সোজা এসে উপস্থিত হল, আলিপুর জেলে। জেলারের কক্ষে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন

করে বলল,—বন্দী বিজয় চট্টরাজের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—বিজয় চট্টরাজ, মানে—রায়বাহাদুর সনাতন সারখেলের—

তার কথা সমাপ্ত করতে না দিয়েই মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—ইয়েস্ ইয়েস্ ছাট্ বিজয়, এ্যাণ্ড আই ওয়াণ্ট টু সী হিম এ্যালোন।

—অলরাইট, মিঃ ষ্টল্‌বা।

জেলার সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে জমাদারের সঙ্গে সাধারণ কয়েদীর বেশে বিজয় এসে ঢুকল ঘরে। পরনে তার হাফ প্যাণ্ট আর হাফ সার্ট—একই ধরণের কাপড়ে তৈরী,—সাদার ওপর কালো কালো লম্বা টানের ছিট্। জামার বুকে একটা নম্বর। নম্বরটাই এখানে বিজয়ের একমাত্র পরিচয়। তাকে নিয়ে কিছু বলতে হলেই বলা হয়—অত নম্বরের কয়েদী, চুরির অপরাধে সে এখানে এসেছে,—নিম্ন শ্রেণীর অতি সাধারণ কয়েদী হিসেবে সে এখানে পরিগণিত।

মিঃ ষ্টল্‌বা তার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে দেখল। জমাদারকে বলল,—তুমি বাইরে যাও।

জমাদার বাইরে যেতেই মিঃ ষ্টল্‌বা আস্তে আস্তে গম্ভীর স্বরে বলল,—আমি জানি বিজয়বাবু, বিনা অপরাধে আপনি শাস্তি ভোগ করছেন।

—আপনি ?

—আমি মিঃ ষ্টল্‌বা—মিস ইভা চৌধুরীর কেসে অনুসন্ধান করবার জন্যে জার্মানী থেকে কলকাতা এসেছি।

বিজয়ের বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটেনি।

মিঃ ষ্টল্‌বা বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা বুঝতে পেরে বলল,—কি, আমার মুখে বাংলা কথা শুনে অবাক হচ্ছেন ?

—আপনি যে বাঙ্গালী নন, আপনার কথা শুনে তা বোঝা মুস্কিল।

—তা ঠিক। বাংলা ভাষার উচ্চারণ আমার এত ভাল যে, অনেকেই আপনার মত বিস্ময় বোধ করে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আপনি যে টাকাটা নেননি তা কি প্রমাণ করতে পারতেন না ?

—রায়বাহাদুরের সু-চেষ্টায় আমার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

—রায়বাহাদুর আপনার ওপর এত বিরূপ ছিলেন কেন ?

—কেন না আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম যে, ইভা দেবীর হত্যাকারী তিনি স্বয়ং।

—আপনার সন্দেহ পুলিশকে বলেন নি কেন ?

—বলে কোন লাভ হত না। আমি শুধু সন্দেহই করেছিলাম, কোন প্রমাণ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যখন জানলাম, ইভা দেবীও রায়বাহাদুরকে 'ব্ল্যাকমেল' করেছেন, তখন

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে আরও গোলমেলে হয়ে গেল।

—মিস্ চৌধুরী 'ব্ল্যাকমেল' করেছিল আপনি কিসে বুঝলেন ?

—তাঁর মৃত্যুর পরের দিন খবরের কাগজে পোষ্ট-মর্টম রিপোর্ট পড়ে।

—কি রকম ?

—যেদিন উনি মারা যান, সেদিন রাত্রে রায়বাহাদুরকে উনি বলেন যে, ওঁর গর্ভে রায়বাহাদুরের সন্তান এসেছে। রায়বাহাদুরকে বলেন, বিয়ে করে ওঁর সম্ভ্রম বাঁচাতে। কিন্তু বিয়ে করতে রায়বাহাদুর কিছুতেই সম্মত হলেন না।—গর্ভের সন্তাম নষ্ট করে ফেলবার উপদেশ দিলেন। ইভা দেবী সন্তান নষ্ট করতে রাজী হলেন না। শেষে রায়বাহাদুরের কাছে ত্রিশ হাজার টাকা চেয়ে নেন উনি—আর ভবিষ্যতে রায়-বাহাদুরের সংস্পর্শে কোনদিন আসবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। রায়বাহাদুর ওঁকে ত্রিশ হাজার টাকা দেন এই সর্তে যে, ভবিষ্যৎ সন্তান কোনদিন তার পিতৃ-পরিচয় জানবেনা। ইভা দেবী সেই সর্তেই টাকা নিয়ে বাড়ী চলে যান। সেই রাত্রেই ইভা দেবী মারা যান। কিন্তু পোষ্ট-মর্টম রিপোর্টে ইভা দেবী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন—একথার কোন উল্লেখ ছিল না।

বিজয় দেখল, তার কথা শুনতে শুনতে মিঃ ষ্টল্‌বার মুখ

ভীষণাকার ধারণ করেছে, তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছুটছে।

বিজয় তার ভাবান্তর লক্ষ্য করছে বুঝতে পেরে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—তা আপনি এসব খবর জানলেন কি করে?

—সেদিন রাত্রে একটা কাজের ব্যাপারে আমিও রায়-বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার যেতে একটু রাত হয়েছিল। আমি রায়বাহাদুরের ঘরের কাছে যেতেই, ঘরের ভেতরে নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে তাঁর ঘর সংলগ্ন বারান্দায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কৌতূহলবশেই আড়ি পেতে শুনেছিলাম—ঘরের ভেতরে তাদের কথাবার্তা।

—আচ্ছা এবার আপনি যান। দরকার হলে, আবার আমি আসব।

জমাদারকে ডাক দিল মিঃ ষ্টল্‌বা।

—হুজুর!

জমাদার ঘরে প্রবেশ করল।

—বাবুকো লে যাও।

বিজয়কে নিয়ে জমাদার চলে যাবার আগেই মিঃ ষ্টল্‌বা ঘর ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

হোটেলে এসে চুরুট মুখে দিয়ে, দেশলাইয়ের জন্য পকেটে হাত দিতেই এক টুকরো কাগজ হাতে ঠেকল মিঃ ষ্টল্‌বার।

কাগজখানা বের করে দেখল, লেখা আছে—

"সাবধান বিদেশী, ঘরে ফিরে যাও—

আর এগিয়ো না—মরবে।"

মিঃ ষ্টল্‌বা সারা রাস্তা এত বেশী অন্যমনস্ক ছিল যে, কখন, কে কাগজের টুকরোটুকু পকেটে রেখে দিয়েছে বুঝতে পারে নি। টুকরোটুকু পড়ে কপালটা কুঁচকে গেল তার। সেটা পকেটে রেখে দিয়ে চুরুট ধরাল মিঃ ষ্টল্‌বা।

সতেরো—

সেদিন সকাল বেলাতেই রায়বাহাদুর শ্যামলীর বাড়ীতে এলেন, কাগজে মোড়া দুটো প্যাকেট হাতে করে।

শ্যামলী তখন স্নানের ঘরে।

বুধীর মা রায়বাহাদুরকে বসিয়ে স্নানের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাড়িয়ে চেঁচিয়ে জানাল, রায়বাহাদুরের আগমনবার্তা।

শ্যামলী উত্তর দিল,—একটু চায়ের জল বসিয়ে দাও,—আমি আসছি।

—আচ্ছা দিচ্ছি।

কিছু পরে ধুমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রায়বাহাদুরের সামনে এসে দাঁড়াল শ্যামলী।

রায়বাহাদুর বসে বসে অনাবশ্যকভাবে খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলোচ্ছিলেন।

শ্যামলীর দিকে তাকালেন রায়বাহাদুর। সদ্য স্নান করে এসেছে শ্যামলী, সকালবেলা শ্রীমণ্ডিত লাবণ্যময়ীর রূপ রায়বাহাদুরকে বিভ্রান্ত করল। অনাঘ্রাতা পুষ্পকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পেয়ে, উপভোগ বাসনা বলবতী হয়ে উঠল তাঁর মনে।

তার প্রতি রায়বাহাদুরের নিবদ্ধ দৃষ্টিকে আঘাত করে শ্যামলী বলে উঠল,—চা নিন।

—হ্যাঁ, দাও।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে রায়বাহাদুর বললেন—তোমাকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে,—তাই আমি দেখছিলাম।

শ্যামলী রায়বাহাদুরের কথার কোন উত্তর দিল না, মুখ নীচু করে থাকল।

কাগজের প্যাকেট দুটো দেখিয়ে রায়বাহাদুর বললেন,—এ দুটো নাও।

—কি আছে এতে ?

—তোমার জন্যে কয়েকটা জামাকাপড়।

—আমার জামা কাপড়ের এখন তো কোন দরকার নেই,—শুধু শুধু কেন এসব আনলেন ?

—আজ দরকার না থাকলেও, দরকার হবে তো। সব সময় আমার তো খেয়াল থাকে না সব কিছু—তাই আজ মনে পড়তেই নিয়ে এলাম এগুলো।

শ্যামলী প্যাকেট দুটো সম্বন্ধে আর কোন কথা বলল না, বা হাতে করেও নিল না।

মাথা নীচু করে টেবিল-ক্লথটার ওপর আঙুল টানতে টানতে শ্যামলী বলল,—একটা কথা ভাবছিলাম।

—কি ?

—আপনি কাল বলছিলেন, দাদা না থাকাতে আপনার কাজকর্মের খুব অসুবিধে হচ্ছে। তারপর আপনার

সেক্রেটারীর মৃত্যুর পর আর কোন সেক্রেটারীও নিয়োগ করেন নি। তাই বলছিলাম,—চিঠিপত্র লেখার কাজটা অন্ততঃ আমি তো করতে পারি। শুধু শুধু আপনার কাছ থেকে সাহায্য নেবার দায় থেকে তবে কিছুটা মুক্ত হতে পারি।

—আমার কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করতে তোমার আত্মসম্মানে বাধছে—বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি তো বিজয়কে কখনও পর ভাবিনি। তুমি বিজয়ের বোন। তুমিও আমার স্নেহের পাত্রী। তা বেশ, তোমার আত্মসম্মানে আমি আঘাত করব না। আমার সেক্রেটারীর কাজটা তুমিই তোমার অবসর সময়ে চালিয়ে দিও।

—কলেজের পর ঘণ্টাদুয়েক কাজ করলে কি আপনার চলবে?

—তা চলবে;—তবে প্রথম প্রথম কাজ বুঝে নিতে তোমাকে একটু বেশী সময় দিতে হবে বোধ হয়। কাজও জমে রয়েছে অনেক। এইসব গণ্ডগোলে আমি তো কোনদিকে আর কিছু দেখতে পারিনি। তা হলে আজ থেকেই কাজে লেগে যাও, কি বল?

—বেশ।

—আমি সন্ধ্যা ছটায় গাড়ী পাঠিয়ে দেব। আর রাত্রে ওখানেই খাবে আজকে।

—খাওয়া—

—হয়ত একটু দেরী হবে কাজ বুঝে নিতে, প্রথম তুদিন তোমার আমার ওখানেই নিমন্ত্রণ থাকল।

শ্যামলীকে কোনরকম আপত্তি করবার অবসর না দিয়ে রায়বাহাতুর বললেন,—আচ্ছা, এখন উঠি, কতকগুলো জরুরী কাজ রয়েছে।

রায়বাহাতুর চলে গেলেন।

আঠারো—

সেদিন সন্ধ্যায় রায়বাহাদুরের প্যাকার্ডে চড়ে শ্যামলী এল রায়বাহাদুরের বাড়ী।

রায়বাহাদুরের বাড়ীতে শ্যামলীর এই প্রথম আগমন।

গাড়ীবারান্দার নীচে গাড়ী এসে দাঁড়াতেই, শ্যামলী নেমে পড়ল। মালতী সিঁড়ির ওপরই দাঁড়িয়ে ছিল। সে শ্যামলীক সাথে করে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে শ্যামলী প্রশ্ন করল,—রায়বাহাদুর আছেন তো ?

বাবু ওপরে তাঁর ঘরে আছেন, তাঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

মালতী শ্যামলীকে নিয়ে রায়বাহাদুরের দোর গোড়ায় এসে বলল,— যান, ভেতরে বাবু আছেন।

শ্যামলী দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

—এসেছ তুমি ? এস।

শ্যামলী রায়বাহাদুরের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। একরাশ কাগজপত্র টেবিলে ছড়ানো, রায়বাহাদুর সেগুলো দেখছিলেন।

—বস। এই দেখ, কত কাজ জমে রয়েছে। আমি

কয়েকটা জরুরী চিঠি বেছে দিচ্ছি, তুমি ড্রাফ্‌ট্‌ করে ফেল। তুমি টাইপ তো জান না।

—সামান্য জানি।

—বেশ, বেশ, তা হলে ভালই হল। ড্রাফ্‌ট্‌ একেবারে টাইপ করে নিয়ে এস। প্রথমে এই চিঠিটা নাও, একটা ফরম্যাল এ্যাকনলেজমেণ্ট পাঠিয়ে দাও।

চিঠিখানা তিনি শ্যামলীর হাতে তুলে দিলেন। পুনরায় বললেন,—এই চিঠিগুলো পড়ে নিও। ক্যাবিনেটে সব ফাইল আছে, ফাইল লিষ্টটাও ওখানে পাবে। রেফারেন্স সব তুমি রেস্‌পেক্‌টিভ ফাইলে পাবে।

চিঠিগুলো শ্যামলীর হাতে দিয়ে রায়বাহাদুর ডাকলেন,—মালতী!

মালতী এসে ঘরে ঢুকল।

—এঁকে অফিস ঘরে নিয়ে যাও। শ্যামলী, তুমি অফিস ঘরে টাইপরাইটার কাগজপত্র সবই পাবে। কোন অসুবিধা হলে, আমাকে জানিও।

শ্যামলী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চিঠিগুলো নিয়ে মালতীর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচে অফিসঘরে এসে শ্যামলী চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘরের মাঝে একটি বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার দু পাশে গদী-আঁটা কয়েকটা চেয়ার। ঘরের এককোণে রয়েছে ছোট একটি টেবিলের

ওপর পোরটেবল্ টাইপরাইটার। ষ্টীল ক্যাবিনেটও রয়েছে তার কাছেই, দেওয়ালের সঙ্গে লাগান।

—আপনার আর কিছু লাগবে দিদিমণি?

—না, তুমি এবার যেতে পার।

৬

শ্যামলী টাইপরাইটারের ঢাকনা খুলল। গদী আঁটা দোলা-চেয়ারে বসে টেবিলের ড্রয়ার টেনে কাগজ বের করে টাইপরাইটারে চড়াল।

—চিঠির ড্রাফ্‌ট্ করে রায়বাহাদুরকে দিয়ে এসে অন্য চিঠিগুলো পড়তে আরম্ভ করল শ্যামলী।

কিছুক্ষণ পর মালতী এসে বলল,—বাবু ডাকছেন দিদিমণি।

—চল যাচ্ছি।

শ্যামলী রায়বাহাদুরের ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন—চিঠিগুলো পড়ছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল এসে আবার বাকীগুলো পড়। খেয়ে নেওয়া যাক, চল।

রায়বাহাদুর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। শ্যামলীকে সাথে করে খাবার ঘরে নিয়ে এলেন তিনি। নিজে একটি

চেয়ারে বসে, শ্যামলীকে অন্য একটি চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন,—বস।

টেবিল চেয়ারে বসে ভাত খাওয়া শ্যামলীর অভ্যাস নেই। তবুও বসতে হল।

খাওয়ার পর রায়বাহাদুরের গাড়ীতেই সে বাড়ী ফিরল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শ্যামলী তার নূতন চাকরির কথা ভাবতে লাগল।

চিঠি পড়ে পড়ে তার উত্তর লেখা,—বেশ আনন্দদায়ক কাজ। তারপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, রায়বাহাদুরের সৌজন্য ব্যবহার—সব মিলিয়ে তার মন্দ লাগল না।

কয়েকটা চিঠি পড়ে, তার রেফারেন্সগুলো ফাইল থেকে দেখে নিয়েছিল শ্যামলী। এখন মনে মনে সে চিঠিগুলোর উত্তরের খসড়া করতে সুরু করল। উৎসাহী হয়ে উঠল শ্যামলী, নূতন চাকরীর মোহে।

চাকরি করবে সে, একথা তার মনেও হয়নি কোনদিন। মেয়েদের চাকরি,—বড় জোর স্কুল মাষ্টারণী—এই রকমই একটা ধারণা শ্যামলীর মনের মধ্যে ছিল। মেয়েদের আত্ম-নির্ভরতার কথা চিন্তা করলে, এক স্কুল মাষ্টারণী করা ছাড়া অন্য কিছু তার মাথায় আসেনি।

সেক্রেটারীর চাকরির মাধুর্য শ্যামলী অনুভব করল। এরকম ধরণের চাকরির মধ্যে এক ঘেঁয়েমি নেই—আছে আনন্দ। শ্যামলী খুশি হয়ে উঠল এই ভেবে যে, সেও চাকরি করে আত্মনির্ভর হতে পারে।

তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল শ্যামলী।

উনিশ—

আলিপুর জেল থেকে ফিরে মিঃ ষ্টল্‌বা সেদিন হোটেল থেকে আর বেরুল না সারাদিন।

সন্ধ্যার কিছু পর হোটেল থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গেল মিঃ ষ্টল্‌বা। কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে বুঝতে পারল। মিঃ ষ্টলবার মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি এল,—ব্রিষ্টল হোটেলের সামনে থেকে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বলল,—হেষ্টিংস চল।

ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি এসে মিঃ ষ্টলবা পেছনে তাকিয়ে দেখল, আর একটি ট্যাক্সি তার পিছু নিয়েছে। রিভলভারটি হাতে নিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা প্রস্তুত হয়ে নিল।

পেছনের ট্যাক্সিটি যখন প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে মিঃ ষ্টল্‌বা চক্ষের নিমেষে পেছন থেকে সিট ডিঙ্গিয়ে ড্রাইভারের পাশে গড়িয়ে পড়ল, ড্রাইভার কিছু বোঝবার আগেই পর পর দুটো গুলির শব্দ হল।

পেছনের ট্যাক্সিটি অতি দ্রুত পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। মিঃ ষ্টলবা তৎক্ষণাৎ মাথা উঁচু করে আগের ট্যাক্সির টায়ার লক্ষ্য করে পর পর গুলি ছুড়ল,—কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তার।

ড্রাইভারকে বলল,—বকশিস্ দেব—ঐ ট্যাক্সিকে ধরা চাই।

মিঃ ষ্টল্‌বার ট্যাক্সি অতি দ্রুত ছুটে চলল, কিছুক্ষণের মধ্যে পূর্বতন গাড়ির পেছনে লাল আলো নজরে পড়ল। উল্কার মত ছুটে চলেছে গাড়িটি খিদিরপুরের দিকে।

কিন্তু ছুর্দৈব, মিঃ ষ্টল্‌বার ট্যাক্সির টায়ার পাঙ্‌চার হয়ে, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিরক্ত হয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে,—অন্য একটি ট্যাক্সিতে করে কলকাতায় ফিরল।

কেশব সেন ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল মিঃ ষ্টল্‌বা।

তারপর হেঁটে সুকিয়া রোতে মিস চৌধুরীর বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গেল মিঃ ষ্টল্‌বা। মিস্‌ চৌধুরীর বাড়ীর দরজায় টুল পেতে বসে পুলিশ প্রহরা দিচ্ছে। মিঃ ষ্টল্‌বাকে সে লক্ষ্য করল না।

মিঃ ষ্টল্‌বা কিছুদূর গিয়ে রাস্তা ঘুরে মিস্‌ চৌধুরীর বাড়ীর পেছনে এঁদো গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কয়েকটা দোতলা, তিনতলা বাড়ীর পেছন দিকে এই এঁদো গলি। যাতায়াতের রাস্তা নয় সেটা, আবর্জনা জমে জমে স্যাঁতসেতে ভাপ্‌সা গন্ধ গলিটার মধ্যে।

মিস্‌ চৌধুরীর বাড়ীর পেছন দিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীর খুব উঁচু নয়। মিঃ ষ্টল্‌বা হাতের ওপর ভর দিয়ে

লাফিয়ে প্রাচীরের ওপর উঠে পড়ল। তারপর ভেতরে লাফিয়ে পড়ল।

মিনিট পনের পর মিঃ ষ্টল্‌বা ঐ গলিপথেই আবার বেরিয়ে এল ইভা চৌধুরীর বাড়ী থেকে।

কেশব সেন ষ্ট্রীট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা "ব্যাকট্রোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে" এসে উপস্থিত হল।

ইনষ্টিটিউটের রেসিডেণ্ট ডাক্তার—ডাঃ মুখার্জি ইনষ্টি-টিউটের ওপরে একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। মিঃ ষ্টল্‌বা তাঁকে খবর পাঠাল।

ডাঃ মুখার্জি আসতেই মিঃ ষ্টল্‌বা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল,—বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

—না, না, বিরক্ত কিসের, জরুরী প্রয়োজনের জন্যেই তো একজন করে রেসিডেণ্ট ডাক্তার এখানে থাকেন। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

পকেট থেকে রুমালে জড়ানো, ছোট ইনজেকশনের এ্যামপুলের মত একটা এ্যামপুল বের করে ডাঃ মুখার্জির হাতে দিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—এটার মধ্যে কোন মারাত্মক রাসায়নিক আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে কোন প্রাণীর দেহে এ রাসায়নিকের ঘ্রাণ প্রবেশ করলে কি 'রিএ্যাক্‌শন' হয়, দয়া করে আমাকে আজ রাত্রেই জানাবেন। আমাকে

টেলিফোন করবেন,—গ্র্যাণ্ড হোটেলে।—আমি হোটেলে গিয়ে আপনার টেলিফোনের অপেক্ষা করব।

—বেশ, আমার পরীক্ষা শেষ হলেই আপনাকে জানাব।

—ধন্যবাদ, কিন্তু সাবধান আপনার নিশ্বাসের সঙ্গে যেন আপনার দেহে না প্রবেশ করে।

—আমরা এ বিষয়ে খুবই সাবধান।

—গুড নাইট্।

হোটেলে ফিরে মিঃ ষ্টল্‌বা ফোনের অপেক্ষা করতে লাগল।

মিঃ ষ্টল্‌বা চুরুট মুখে দিয়ে সারা ঘরময় পায়চারি করছে,—ফোন তখনও আসেনি।

রাত প্রায় এগারোটা বাজল; মিঃ ষ্টল্‌বা অস্থির হয়ে উঠল।

ঠিক তখনই ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন তুলে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—মিঃ ষ্টল্‌বা স্পিকিং⋯

—ডক্টর মুখার্জি দিজ এণ্ড।

—কি হলো বলুন?

—আমি একটা ইঁদুর আর কুকুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই দুটো প্রাণীই প্যারালিটিক হয়ে

গেল ; তারপর কিছুক্ষণ আগে কুকুরটি মারা গেল। ইঁদুরটি মরেছে অনেক আগেই।

—ধন্যবাদ ডক্টর মুখার্জি, আমি এই খবরটুকুর জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।

ফোন ছেড়ে দিল মিঃ ষ্টল্‌বা।

তারপর কালো পোষাকে সজ্জিত হয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের সামনে থেকে ট্যাক্সি নিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা ছুটে চলল রায়বাহাদুরের বাড়ীর দিকে।

কুড়ি—

মিঃ ষ্টল্‌বা যখন হোটেলের ঘরে বসে ডাঃ মুখার্জির টেলিফোনের অপেক্ষা করছিল—রায়বাহাদুর সনাতন সরখেল ইত্যবসরে শ্যামলীর সর্বনাশ সাধনের সব পরিকল্পনা সমাপ্ত করে এনেছেন।

সরলা মেয়ে রায়বাহাদুরকে এতটুকু সন্দেহ করবারও অবকাশ পায়নি।

মেয়েদের প্রতি রায়বাহাদুরের দুর্বলতা প্রচণ্ড। যেন কোন মেয়েকে আয়ত্তে আনবার কৌশলও তিনি ভাল জানেন। অধিকন্তু রায়বাহাদুরের বয়সটাও তাঁর হীন উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মস্ত সহায়ক। কোন মেয়েই তাঁকে সন্দেহ করতে পারে না—তারপর রায়বাহাদুরের স্বরূপ যখন বুঝতে পারে, তখন তাঁর জাল থেকে বেরিয়ে আসবার আর কোন পথ থাকে না।

আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে শ্যামলীকে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলেছেন রায়বাহাদুর। প্রথম বিজয়ের বাড়ীতে শ্যামলীকে দেখবার পর থেকেই তাকে লাভ করবার দুর্নিবার বাসনা দিনের পর দিন রায়বাহাদুরকে পাগল করে তুলেছে।

আজ সমস্ত বাধা অপসারিত। শ্যামলী তাঁর আয়ত্তাধীনে। আজ রাত্রেই রায়বাহাদুর তাঁর মনস্কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় শ্যামলী তাঁর বাড়ীতে আসতেই রায়বাহাদুর বললেন,—আমি একটু কাজে বাইরে যাচ্ছি—তুমি চিঠিগুলো পড়ে ড্রাফ্‌ট করে ফেল। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব—আমি না আসা পর্যন্ত তুমি থেক,—চলে যেওনা যেন। এখানে তোমার রাত্রে খাবার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই।

রায়বাহাদুর বেরিয়ে গেলেন—শ্যামলীও চিঠিগুলো নিয়ে অফিস ঘরে এসে বসল।

চিঠির উত্তর লিখতে লিখতে রাত নটা বাজল,—তখনও রায়বাহাদুর ফেরেননি।

শ্যামলী বাড়ী ফেরবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে মালতীকে জিজ্ঞাসা করল—রায়বাহাদুরের ফিরতে বোধ হয় রাত হবে,—আমি আজ না হয় যাই।

—আপনি চলে যাবেন? কিন্তু বাবু যে বলে গেলেন আপনি এখানে খাবেন? আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনার খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রায়বাহাদুর অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন। বললেন,—একটা কাজে আটকিয়ে পড়েছিলাম, তুমি চিঠিগুলো সব লিখে ফেলেছো নাকি?

—হ্যাঁ।

—বেশ, ও আমি পরে দেখে নেব। মালতী, আমাদের খেতে দিতে বল।

মালতী চলে যেতেই রায়বাহাদুর বললেন,—একটা জরুরী চিঠি আছে,—খাবার পর চিঠিটা করে দিও। কাল ভোরেই লোক এসে এই চিঠিটা নিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, তোমার বাড়ী হয়েই আমি আসছি। তোমার ফিরতে রাত হবে ভেবে, বুধীর মাকে বলে এসেছি—আজ আর তুমি ফিরবে না। আজ এখানেই থেকে যাও—তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

—রাত্রে বাইরে থাকাটা—মানে, আমি কোনদিন রাত্রে বাইরে থাকিনি কিনা!

—তাতে কি হয়েছে। এটাতো আর অন্য কোথাও নয়, আমার বাড়ী। চিঠিটা নেহাৎ জরুরী—আর আমার অন্য লোক নেই, তাই তোমাকে অনুরোধ করছি।

—আচ্ছা, আপনি যখন বুধীর মাকে বলেই এসেছেন, বুধীর মা অনর্থক ভাবনায় পড়বে না আর।

—হ্যাঁ—সেই ভাল, আজ এখানেই থেকে যাও—এত রাত্রে আর রাস্তায় বেরিয়ে কাজ নেই।

—খাবার দেওয়া হয়েছে বাবু।

মালতী এসে জানাল।

—চল, আগে খেয়ে নেওয়া যাক্।

মালতী, রায়বাহাদুর ও শ্যামলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়ার পর রায়বাহাদুর শ্যামলীকে চিঠিটা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, কি জবাব দিতে হবে।

অফিস ঘরে শ্যামলী চিঠিটা টাইপ করতে আরম্ভ করল।

মালতী রায়বাহাদুরকে পান দিতে এল ঘরে।

রায়বাহাদুর একটি পান মুখে দিয়ে বললেন,—সব ঠিক আছে তো মালতী?

—আমার কাছে কোনদিন বেঠিক কিছু দেখেছেন বাবু?

—না, সেই জন্যেই তো তোমার সব আবদার সহ্য করি।

—বাবু?

-কি?

—একছড়া বিছেহার চাই এবার।

—আচ্ছা হবে।

আহ্লাদে গদগদ হয়ে মালতী চলে গেল।

কাজ শেষ হলে শ্যামলীকে নিয়ে মালতী তার নির্দিষ্ট শয়ন কক্ষে পৌঁছে দিল।

সুসজ্জিত কক্ষ। বড় আয়না-বিলম্বিত ড্রেসিং টেবিল, স্প্রিং-এর খাট, আর সৌখিন আসবাবে সাজানো ঘরখানা।

—এ ঘরে কে থাকে মালতী ?

—কেউ না। ইভা দিদিমণি মাঝে মাঝে থাকতেন, যেদিন তাঁর বাড়ী ফিরতে রাত হত।

—ও !

—আপনি শুয়ে পড়ুন দিদিমণি ; আমি দুধ নিয়ে আসছি।

শ্যামলী বাথরুমে ঢুকল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল, মালতী একটা কাঁচের গ্লাসে দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—এই দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ুন দিদিমণি।

শ্যামলীর হাতে গ্লাসটা তুলে দিল মালতী।

শ্যামলী চুমুক দিয়ে দুধটা খেয়ে মালতীর হাতে গ্লাসটি ফেরৎ দিল।

—এবার শুয়ে পড়ুন দিদিমণি।

মালতী চলে যেতেই শ্যামলী দরজা বন্ধ করে দিল।

শুয়ে পড়ল শ্যামলী। চোখ দুটো তার ঘুমে জড়িয়ে আসছে। শ্যামলী ভাবল—নরম গদি আঁটা স্প্রিংএর খাটে শুয়ে বুঝি আরামে তার ঘুম আসছে।

শ্যামলীর ঘর থেকে বেরিয়ে মালতী রায়বাহাদুরের ঘরে এসে ঢুকল।

—শুয়েছে ?

—দুধ খাইয়ে শুইয়ে রেখে এলাম।

—ওষুধটা ঠিকমত দিয়েছিলি তো?

—আমি কি নতুন লোক বাবু?

—আচ্ছা এবার যা।

মালতী চলে গেল।

একটি কালো ছায়া রায়বাহাদুরের ঘরের জানালার কাছ থেকে সরে গেল। রায়বাহাদুর বা মালতী কেউই তা লক্ষ্য করল না।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর পেছনের লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা নেমে বাগানের মধ্যে এসে পকেট থেকে মিনিয়েচর ট্রানস্‌মিটার বের করে সাঙ্কেতিক কোডে লালবাজারে সংবাদ পাঠাল যে, অবিলম্বে এক লরী সশস্ত্র পুলিশ রায়বাহাদুর সনাতন সরখেলের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে।

তারপর প্রাচীর টপকিয়ে রাস্তায় এসে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল মিঃ ষ্টল্‌বা।

এদিকে রায়বাহাদুর তাঁর ঘরে বসে সুরাপাত্রে সোডা সংমিশ্রণের বুদ্‌বুদের দিকে তাকিয়ে স্বীয় বাসনা চরিতার্থতার কল্পনায় বুদবুদের মতই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এক নিশ্বাসে পাত্র উজাড় করে, আবার পাত্র সুরায় পূর্ণ করে নিলেন।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করবার পরেই পুলিশ ট্রাক এসে উপস্থিত হল।

মিঃ ষ্টল্‌বা হাত দেখিয়ে ট্রাক থামিয়ে বলল,—লরী এখানেই থাক। বাড়ী ঘেরাও করতে হবে। মাত্র একজন সার্জেণ্ট আমার সঙ্গে যাবে। বাড়ী থেকে কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই, তাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

সশস্ত্র পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করল। মিঃ ষ্টলবা ও একজন সার্জেণ্ট প্রাচীর টপকিয়ে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

বাগান সংলগ্ন ঠাকুর চাকরদের ঘরের শিকল বাইরে থেকে তুলে দিল মিঃ ষ্টল্‌বা।

অতি সন্তর্পণে মিঃ ষ্টল্‌বা অগ্রসর হল। পেছনে পেছনে সার্জেণ্টও তার অনুসরণ করল।

পেছনের লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়েই মিঃ ষ্টল্‌বা উঠে গেল। দোতলায় বারান্দার সমান্তরালে উঠে রেলিং ধরে বারান্দায় লাফিয়ে পড়ল মিঃ ষ্টল্‌বা। সার্জেণ্টও তার অনুসরণ করল।

রায়বাহাদুরের ঘরের জানালার কাছে এসে তারা দেখল, রায়বাহাদুর ঘরের দেওয়াল আলমারীটা খুলে তার মধ্যে ঢুকে গেলেন। আলমারীটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মিঃ ষ্টল্‌বা তখন তাড়াতাড়ি জানালা দিয়েই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

সার্জেণ্টকে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করতে বলে, ঘরের লাইট অফ করে টর্চ জ্বেলে আলমারী খুলে ফেলল মিঃ ষ্টল্‌বা। আলমারীটার মধ্যে ঢুকে একপাশে একটু চাপ দিতেই,

ভেতরের দেওয়াল একদিকে আলগা হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে মিঃ টল্‌বা দেখল, পাশের ঘরে মৃদু নীল আলো জ্বলছে। একটি মেয়ে খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে,—আর রায়বাহাদুর তার খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়বাহাদুর খাটে বসে মেয়েটির গায়ে হাত দিতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভয়ে সে চীৎকার করে উঠল,—কে?

রায়বাহাদুরকে ঠেলে দিয়ে উঠে বসল মেয়েটি।

—আমি, আমি।

রায়বাহাদুর জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন।

—রায়বাহাদুর, আপনি!

—হ্যাঁ, তোমাকে আমি ভালবাসি শ্যামলী।

—ছিঃ আপনি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কি সব যা তা বলছেন। যান, ঘর থেকে চলে যান,—আমার ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুম তো তোমার পাবেই, তোমাকে যে মালতী ঘুমের ওষুধ দিয়েছে।

—এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—ছিঃ, আপনি এত নীচ! এত বয়স হয়েছে আপনার—

—বয়স দেখে ঘৃণা কর না, ইভাও প্রথমে তোমার মত বয়সের দোহাই দিয়েছিল; কিন্তু পরে সে বুঝেছিল, আমার বয়সটা কিছুই নয়।

—আপনার ঘৃণ্কারজনক কথা আর আমি শুনতে চাই না। আপনি চলে যান,—না হলে আমি চীৎকার করব।

—তাতে কোন লাভ হবে না, তোমার চীৎকার কারও কানে পৌঁছবে না। কেন শুধু শুধু বিরূপ হচ্ছ শ্যামলী, আমার উদ্দেশ্য সফল করতেই হবে।

—আমাকে মেরে ফেললেও আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

—এত তেজ তোমার কতক্ষণ থাকবে শ্যামলী। আমার কথায় রাজী হলে, তোমার কোন অভাব রাখব না। আমাকে বাধা দিয়ে তোমার জেদ বজায় রাখতে পারবে না। এখনই গভীর ঘুমে তুমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে—বাধা দেবার কোন শক্তিই তোমার থাকবে না।

—হে ভগবান!

নিজের অসহায়তার কথা ভেবে হুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল শ্যামলী।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ ষ্টল্‌বা রিভলভার হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আদেশ করল,—মাথার ওপর হাত তুলুন রায়বাহাত্বর।

রায়বাহাত্বরের ঠিক পেছন দিকে মিঃ ষ্টল্‌বা দাঁড়িয়ে।

রায়বাহাত্বরের নেশা ছুটে গেল। আস্তে আস্তে মাথার ওপর ছ'হাত তুললেন।

সার্জেণ্টও তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। মিঃ ষ্টল্‌বা তাকে বলল,—এ্যারেষ্ট হিম।

সার্জেণ্ট রায়বাহাত্বরের দেহ সার্চ করতে লাগল।

কিছু পাওয়া গেল না। তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল সার্জেণ্ট।

শ্যামলী এতক্ষণ যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দেখছিল।

মিঃ ষ্টল্‌বা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—আপনি কে?

—আমি শ্যামলী, বিজয় চট্টরাজের বোন।

—আপনি বিজয়বাবুর বোন? এবার বুঝতে পেরেছি, রায়বাহাদুর কেন বিজয়বাবুকে জেলে পাঠিয়েছেন।

—আমি বিজয়কে জেলে পাঠিয়েছি,—এ কথার অর্থ কি ষ্টল্‌বা?

—অর্থ এই যে, এই মেয়েটির ওপর অভদ্রোচিত আচরণের সুযোগ গ্রহণ করা।

—আজ ড্রিঙ্কের মাত্রা বেশী হয়ে গিয়েছে, তাই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় শ্যামলীর সঙ্গে আমার ব্যবহার হয়ত ভদ্রোচিত হয়নি। শ্যামলী, আমার ব্যবহারে আমি লজ্জিত। আমার অপ্রকৃতিস্থতার কথা ভেবে, আমায় তুমি ক্ষমা কর

—বাঃ! চমৎকার রায়বাহাদুর! মেয়েরা আপনার অভিনয়ে ভুল করে, কিন্তু মিঃ ষ্টল্‌বাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ইভাকে আপনি ত্রিশ হাজার টাকা কেন দিয়েছিলেন?

রায়বাহাদুর আর কোন কথা বললেন না।

—কি, চুপ করে গেলেন যে? সার্জেন্ট, গার্ড হিম, আই উইল সার্চ দি হোল হাউস।

মিঃ ষ্টল্‌বা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রায়বাহাদুরের ঘর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগল—মিঃ ষ্টল্‌বা। ঘরের দেওয়াল চারধারে লাঠি দিয়ে টোকা মেরে মেরে দেখতে লাগল, কোথাও ফাঁপা আছে কিনা? ড্রয়ার খুলে জিনিষপত্র তছনছ করে,—কোথাও কিছু পেল না।

তারপর নীচে নেমে গেল মিঃ ষ্টল্‌বা।

মালতী হাতে একটা পোট্‌লা নিয়ে পালাবার উদ্যোগ করছিল। মালতী শ্যামলীর ঘরে আড়ি পেতে বুঝতে পেরেছিল, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মিঃ ষ্টল্‌বাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে, আত্মগোপন করবার চেষ্টা করতেই মিঃ ষ্টল্‌বা রিভলভার তুলে বলল,—পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করব, দাঁড়াও।

মালতী দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিঃ ষ্টল্‌বা তার কাছে এসে বলল,—তুমি শ্যামলীকে যে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছ, সেটা আমাকে দেখাও।

—আমি কিচ্ছু জানি না, সাহেব।

—মিথ্যে বলবার চেষ্টা করনা, রায়বাহাদুর সব স্বীকার করেছেন, তুমিই তাকে ওষুধ দিয়েছ।

মালতী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,— কি, আমি ওষুধ দিয়েছি, তাই বলেছে ?

—হ্যাঁ। তুমি মিথ্যে বলবার চেষ্টা করলে—জেলে পুরে দেব তোমাকে।

—আমি কিছু জানিনা, সাহেব, রায়বাহাদুর একটা সিদ্ধির পুরিয়া দিয়ে বলল,—দিদিমণির দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে।

—কোথায় সে পুরিয়া, আমাকে দেখাবে চল ?

—ছাদে রান্নাঘরের মধ্যে পুরিয়ার কাগজ পড়ে আছে।

—চল রান্নাঘরে।

মালতীর পেছন পেছন মিঃ ষ্টল্‌বা রান্নাঘরে এল। রান্নাঘরের মেঝে থেকে একটা সাদা কাগজের পুরিয়া তুলে মিঃ ষ্টল্‌বাকে দিল মালতী।

মিঃ ষ্টল্‌বা কাগজের টুকরোটুকু ভাল করে দেখে, পকেটে রেখে দিল।

—আচ্ছা, নীচে চল।

মালতী ও মিঃ ষ্টল্‌বা এসে শ্যামলীর ঘরে প্রবেশ করল।

রায়বাহাদুর মিঃ ষ্টল্‌বাকে বললেন,—আমি বসতে পারি ?

—এখানে আর বসে কি করবেন, ট্রাকে গিয়ে বসুন এবার।

তারপর সার্জেণ্টের দিকে তাকিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—এঁকে লালবাজারে নিয়ে যান। পুলিশ পাঁচজনকে এখানে রেখে যাবেন। আমাদের জন্যে আর একটি ট্রাক পাঠিয়ে দেবেন। একজন পুলিশকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে যান।

রায়বাহাদুরকে নিয়ে সার্জেণ্ট চলে গেল।

শ্যামলী খাটের ওপর বসে ঘুমে ঢুলছিল।

—আপনি শুয়ে পড়ুন, শ্যামলী দেবী।

মিঃ ষ্টল্‌বা বলল।

মিঃ ষ্টল্‌বার দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে শ্যামলী বলল, —কি যে ওষুধ খাইয়েছে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।

মালতী বলল,—ঘুম আমি ছাড়িয়ে দিতে পারি—এনে দেব সাহেব ?

দণ্ডায়মান পুলিশকে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—এর সাথে যাও।

মালতীর পেছন পেছন পুলিশ বেরিয়ে গেল।

শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—আপনার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, আপনি ততক্ষণ শুয়ে পড়ুন।

শ্যামলী আর কোন কথা না বলে শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই মালতী ওষুধটা নিয়ে এল।

মিঃ ষ্টল্‌বার হাত থেকে ওষুধটা নিয়ে, শ্যামলী খেয়ে নিল।

টেবিলের ওপর রক্ষিত খাবার জল নিয়ে মালতী শ্যামলীর চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগল।

শ্যামলী আস্তে আস্তে উঠে ঠিক হয়ে বসল।

মালতী হঠাৎ শ্যামলীর পায়ে হাত দিয়ে বলল,—আমাকে মাপ কর দিদিমণি, বাবুর কথায় আমি তোমাকে দুধের সঙ্গে সিদ্ধি খাইয়েছিলাম।

শ্যামলী বলল,—এভাবে আর কতজনের সর্বনাশ করেছ ?

মালতী মুখ নীচু করে চুপ করে থাকল। শ্যামলীর কথার কোন উত্তর দিল না।

মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—আচ্ছা মালতী, ইভা শেষ যেদিন রাত্রে এখান থেকে বাড়ী গেল,—তার যাওয়ার পর, রায়বাহাদুর রাত্রে সেদিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল ?

—না সাহেব, ইভা দিদিমণি সেদিন অনেক রাত্রে এখান থেকে গিয়েছিল, তারপর বাবু আর বাড়ী থেকে বেরোয় নি।

—ঠিক বলছ ?

—এই নাক মলছি সাহেব, আর কখনও কি মিথ্যা বলতে পারি ? অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার—গোবিন্দ ঠিকই বলেছিল।

ঠিক সেই সময়ে একজন পুলিশ এসে জানাল, ট্রাক এসে গেছে।

—চলুন শ্যামলী দেবী, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিই।

শ্যামলী উঠে দাঁড়াল।

শ্যামলী ও মালতীকে নিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা বেরিয়ে গেল।

নীচে গিয়ে অপেক্ষমান একজন সার্জেন্টকে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—আজ আপনারা এই বাড়ী গার্ড করুন—আর ঠাকুর চাকরকে তাদের ঘরের শিকল খুলে, ট্রাকে নিয়ে ওঠান।

শ্যামলীকে নিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা ড্রাইভারের পাশে বসল। ঠাকুর চাকর ও মালতীকে নিয়ে চারজন পুলিশ পেছনে উঠল।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

একুশ—

পরদিন লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের ঘরে বসে মিঃ ষ্টল্‌বা কথা বলছিল।

ও. সি.ও উপস্থিত ছিল।

পুলিশ কমিশনার বলল,—রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনি সন্তোষজনক প্রমাণ পেয়েছেন?

—না, রায়বাহাদুর হত্যা করেননি। তবে সরলমতি মেয়েদের ভুলিয়ে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার দোষে তিনি অপরাধী! ইতিপূর্বেও তিনি বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছেন,—তার ইতিহাস বর্ণনা করবে মালতী ঝি। এই ঝির সাহায্যেই বিজয় চট্টরাজের পকেটে টাকা রেখে দিয়ে, তাকে চুরির অভিযোগে জেলে পাঠিয়ে, তার বোন শ্যামলীর ওপর অত্যাচার করবার সুযোগ তৈরী করেছিলেন রায়বাহাদুর। শ্যামলীকে সিদ্ধি খাইয়ে নিস্তেজ করা হয়েছিল। তার ওপর ঠিক অত্যাচারের মুহূর্তে রায়বাহাদুরকে আমরা গ্রেপ্তার করি। রায়বাহাদুরের মত ঘৃণ্য, নীচ লম্পটকে কিছুতেই ক্ষমা করা উচিৎ নয়। সমাজদ্রোহী লম্পট আইনের সর্বোচ্চ দণ্ড পাবারই যোগ্য।

—রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধে যা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, তাতে

তাঁর উপযুক্ত সাজা হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইভা দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি তাহলে কোন প্রমাণই সংগ্রহ করতে পারেন নি।

—হ্যাঁ, প্রমাণ পেয়েছি—আর হত্যাকারীকে আজই রাত্রে ধরতে পারব বলে মনে হয়। আজ রাত্রে ঠিক দশটায় ইভা দেবীর বাড়ীতে যদি আপনারা উপস্থিত হন তবে বুঝতে পারবেন হত্যাকারী কে?

—অলরাইট মিঃ ষ্টল্‌বা—আমি নিজে এঁদের সঙ্গে আজ উপস্থিত থাকব।

পুলিশ কমিশনার বলল।

—বেশ, তবে আপনারা ছদ্মবেশে প্রাইভেট গাড়ীতে করে কেশব সেন ষ্ট্রীটের মোড়ে অপেক্ষা করবেন। আমি কনষ্টবলকে দিয়ে খবর না দেওয়া পর্যন্ত আপনারা যাবেন না। আর অতিরিক্ত আর্মড গার্ড সঙ্গে নেবেন,—তারাও ছদ্মবেশে থাকবে।

—তাই হবে।

তারপর মিঃ ষ্টল্‌বা পুলিশ কমিশনারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইশ—

অন্ধকার রাত্রি। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে কালো পোষাকে আপাদমস্তক ঢাকা একটি মনুষ্যমূর্তি ইভা দেবীর বাড়ীর পেছনে এসে দাঁড়াল।

এদিক ওদিক ইতস্ততঃ তাকিয়ে প্রাচীর টপকিয়ে মূর্তিটি বাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

দূর থেকে মিঃ ষ্টল্‌বা বাড়ীর সামনের দিকে চলে গেল। বাড়ীর দরজায় পাহারারত কনষ্টবলটিকে কেশব সেন ষ্ট্রিটের মোড়ে গিয়ে পুলিশ কমিশনারকে খবর দিতে নির্দেশ দিল।

কিছু পরেই প্রাইভেট দুখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

পুলিশ কমিশনার ও অন্যান্য সবাই নেমে পড়ল।

মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—দুজন আর্মড গার্ড আমার সঙ্গে এস। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুণি আসছি।

দুজন গার্ডকে নিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা দ্রুত চলে গেল। বাড়ীর পেছনের গলি থেকে বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর টপকিয়ে লাফিয়ে পড়ল তারা।

বাগানের মধ্যে একটা জায়গায় রাস্তার 'ম্যান হোলের' ঢাকনির মত একটা ঢাকনি রয়েছে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন 'ম্যান হোলের' ওপরের ঢালাই লোহার ঢাকনি।

সশস্ত্র গার্ডদ্বয়কে মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—এই ঢাকনির পেছন দিকে দাঁড়িয়ে থাক। ঢাকনিটি যেই উঁচু হয়ে উঠবে, বুঝতে পারবে ভেতর থেকে লোক উঠছে। তাকে যেমন করেই হোক গ্রেপ্তার করা চাই। তার কাছে রিভলবার থাকতে পারে।

তাদের নির্দেশ দিয়েই মিঃ ষ্টল্‌বা দ্রুত প্রাচীর টপকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান পুলিশ অফিসারদের নিয়ে মিঃ ষ্টল্‌বা সদর দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করল।

ইভা দেবীর যে ঘরে মৃত্যু হয়েছিল, সেই ঘরের তালা খুলে সবাই ভেতরে প্রবেশ করল।

মিঃ ষ্টল্‌বা বলল,—কোন শব্দ না করে আপনারা আমার অনুসরণ করুন।

টর্চের আলো ঘরের দেওয়ালে ফেলে মিঃ ষ্টল্‌বা এগিয়ে গেল। দেওয়ালের কাছে গিয়ে টর্চ নিবিয়ে দিল। তারপর পুনরায় টর্চ জ্বালতেই দেখা গেল, দেওয়ালের খানিকটা অংশ অপসারিত হয়ে গিয়ে অন্ধকার গহ্বরের সৃষ্টি করেছে।

রিভলভার হাতে মিঃ ষ্টল্‌বা সেই গহ্বরের মধ্যে এগিয়ে গেল। পেছনে পেছনে সবাই তার অনুসরণ করল।

অপরিসর সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। পুলিশ কমিশনার ও অফিসাররা আশ্চর্য হলেও মুখে কিছু বলল না। মিঃ ষ্টল্‌বাকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে তারাও নামতে লাগল।

নীচে নেমে একটা ঘরের মধ্যে এসে সবাই উপস্থিত হল। ঘরে মৃদু আলোর বাল্‌ব জ্বলছে।

মিঃ ষ্টল্‌বা অতি নিম্নস্বরে বলল,—আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন।

তারপর হঠাৎ ঘরের আলো নিবে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। একটু পরেই আবার আলো জ্বলে উঠল। সবিস্ময়ে সবাই লক্ষ্য করল মিঃ ষ্টল্‌বা ঘরের মধ্যে নেই।

ঘরটির কোন দরজা জানালা নেই। চারদিকে কঠিন দেওয়ালে ঘেরা। শুধু ওপরে ওঠবার সিঁড়ি ছাড়া আর কোথায়ও ফাঁক নেই।

হঠাৎ ঘরের দেওয়াল ভেদ করে বাইরে থেকে মিঃ ষ্টল্‌বার গুরুগম্ভীর স্বর তাদের কাণে এসে পৌঁছল।

—মাথার ওপর হাত তোল, ডাঃ জয়ন্ত বোস!

—কে?

চমকে উঠে ডাঃ বোস ফিরে দাঁড়াল।

—তোমার যম।

মুখের নকল দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলল মি. ষ্টল্‌বা।

—জল্লেশবাবু, আপনি?

—হ্যাঁ, আমি। ইভার হত্যার প্রতিশোধ নিতে সুদূর জার্মান থেকে ছুটে এসেছি।

—আপনি ভুল করছেন, আমি দোষী নই।

—ভয় নেই, নিজ হাতে তোমাকে হত্যা করব না।

সর্বসমক্ষে তোমার বিচার হবে। তোমাকে ফাঁসিতে লটকাবার ব্যবস্থা আমি করে যাব।

—আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আপনার আছে?

—যথাসময়ে তার জবাব পাবে। যে বিষাক্ত ওষুধ ইভার ঘুমের মধ্যে তার নাকের কাছে ধরে রেখে তাকে তুমি হত্যা করেছ—সে ওষুধের ampule আমি পরীক্ষা করিয়েছি ; তুমি নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান মনে করেছিলে,—পর্শু সন্ধ্যায় আমার গাড়ীতে গুলি করে ব্যর্থ হয়ে, আজ রাত এগারোটার প্লেনে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছ। আমি ঠিক জানতাম,—কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তোমার আবিষ্কৃত ওষুধ আর কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলবার জন্যে তুমি আজ রাত্রে এখানে আসবে।

—তবুও তুমি পারবে না 'বিপ্লবী ভৈরব',—আমাকে ধরিয়ে দিতে।

—ভুলে যাচ্ছ ডাক্তার বোস,—আমারই গুপ্তগৃহে বসে, তোমার এ আস্ফালন শোভা পায় না। আমি নিজের প্রয়োজনে যে গুপ্তগৃহ নির্মাণ করেছিলাম—একমাত্র ইভা ছাড়া এর সন্ধান কেউ জানত না। ইভার কাছ থেকেই তুমি এই গুপ্তগৃহের সন্ধান পেয়েছ। ইভাকে ভালবাসার ভাণ করে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করেছ তুমি ; এমনকি তাকে হত্যা করে তার ত্রিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করতেও তুমি দ্বিধা কর নি।

—ত্রিশ হাজার টাকা আমাকে দেবার জন্তেই রায়-বাহাদুরকে ইভা 'ব্ল্যাক মেল' করেছিল।

—তবে তাকে হত্যা করলে কেন?

—তাকে বিয়ে না করলে,—সে টাকা দিতে রাজী ছিল না, কিন্তু রায়বাহাদুরের রক্ষিতাকে বিয়ে করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

—ব্যস্, জয়ন্ত বোস, আর নয়।

এতক্ষণ পুলিশ কমিশনার ও অন্য সবাই দেওয়ালে কান পেতে এ ঘরের কথাবার্তা শুনছিল।

মিঃ ষ্টল্‌বা স্থইচ টিপতেই একটা দেওয়াল সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে পুলিশ কমিশনার আর অফিসাররা দ্রুত সেই খোলাপথে এ ঘরে এসে পড়ল।

মিঃ ষ্টল্‌বা আদেশ দিল,—Arrest the murderer.

সার্জেণ্ট ডাঃ বোসকে গ্রেপ্তার করল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বোস চীৎকার করে উঠল,—'বিপ্লবী ভৈরব' পালিয়ে যাচ্ছে, ওকে গ্রেপ্তার কর।

সকলে পেছন ফিরে দেখল, দেওয়ালটি যথাস্থানে এসে দ্রুত লেগে গেল। মিঃ ষ্টল্‌বা সেই পথে পালিয়েছে।

ও. সি. রুদ্ধ দেওয়ালে আঘাত করল, কিন্তু দেওয়াল নড়ল না।

ডাঃ বোস বলল,—দেওয়ালের ডানদিকে স্থইচ আছে, টিপে ধরুন।

ও. সি. সুইচ টিপতেই দেওয়াল সরে গেল।

সেই পথেই ও সি. মিঃ ষ্টল্‌বার দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করল।

'বিপ্লবী-ভৈরব' ততক্ষণে তার নির্দিষ্ট মোটর বাইকে করে উধাও হয়েছে।

ও. সি. দোর গোড়ায় এসে পাহারাদারের কাছে শুনল,—সাহেব মোটর বাইকে করে চলে গেছে।

তার পশ্চাদ্ধাবন বৃথা ভেবে ও. সি. আবার ফিরে এল গুপ্তগৃহে।

পুলিশ কমিশনার ততক্ষণে ডাঃ জয়ন্ত বোসের সুটকেসটি পরীক্ষা করছে।

ঐ সুটকেসের মধ্যেই তার আবিষ্কারের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে পালাবার চেষ্টা করছিল ডাঃ বোস। ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ ষ্টল্‌বা ওরফে 'বিপ্লবী ভৈরব' এসে উপস্থিত হয়েছিল।

পুলিশ কমিশনার সুটকেসের মধ্যে থেকে দুটো ampule হাতে তুলে দেখছিল। মিঃ ষ্টল্‌বা ডাঃ মুখার্জিকে যেরকম ampule পরীক্ষা করতে দিয়েছিল. এ ampule দুটোও দেখতে ঠিক সেই রকম।

ও. সি.কে পুলিশ কমিশনার বলল—আসামীকে সার্চ করুন।

ও. সি. ডাক্তার বোসের ওভার কোটের পকেটে হাত দিয়ে বের করল একটা পিস্তল। ভেতরের পকেট থেকে

বেরুল একখানা পাসপোর্ট আর 'ট্রাভেলার' কোম্পানীর 'ট্রাভেলার্স' চেক বই একখানা ; আরও কতকগুলো টুকিটাকি কাগজ পত্র।

সবগুলো নিয়ে কমিশনার স্যুটকেসে রাখল। তারপর ডাঃ বোসকে নিয়ে সবাই গুপ্তগৃহ থেকে বেরিয়ে এল।

তেইশ—

পরদিন সকালে লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের অফিসে ও. সি. ঢুকতেই পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞাসা করল,—কি, কোন খোঁজ পেলেন ?

—না স্যার। সকালে খবর পেলাম দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে একখানা মোটর বাইক পড়ে আছে। তখনই সেখানে ছুটলাম। দেখলাম, সত্যিই একখানা বাইক গঙ্গার ধারে পড়ে আছে। সেই বাইকই যে 'বিপ্লবী ভৈরবের' তা বোঝা গেল না। তবে ওখানকার কেউ কেউ বলল, কাল নাকি অনেক রাত্রে গঙ্গার ওপর থেকে একখানা প্লেন ওড়বার শব্দ তারা শুনেছে।

—তারা ঠিকই বলেছে। 'বিপ্লবী ভৈরব' আমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছে, পড়ে দেখুন।

"মাননীয় পুলিশ কমিশনার,—

মিঃ ষ্টল্‌বাই যে ছদ্মবেশী 'বিপ্লবী ভৈরব' এতক্ষণে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আমার বোন, ইভার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যেই মিঃ ষ্টল্‌বার ছদ্মবেশে ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে ভারতে ফেরবার সুযোগ তৈরী করতে আমি বাধ্য হই। যে কয়জন জার্মান বন্ধু আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ইতিপূর্বে ভারতে ফেরবার জন্যে—আমি আমার মৃত্যু সংবাদ রটিয়েছিলাম,—কিন্তু তখন কোন কারণে ভারতে ফেরা সম্ভব হয় নি। তারপর জার্মাণীতে বসে যখন অদ্ভুত এক রোগে ইভার মৃত্যু সংবাদ শুনলাম—তখনই আমার সন্দেহ হয়।

কি করে যে, হত্যাকারীকে ধরলাম তা জানতে আপনাদের নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য হবে—সে কথাই এ চিঠিতে জানাচ্ছি।

প্রথমে রায়বাহাদুরকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম। ইভার গুপ্তগৃহ থেকে বিষাক্ত ওষুধের ampule সংগ্রহ করে ব্যাকট্রোলজিকাল ইনষ্টিটিউটের ডাঃ মুখার্জিকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জানলাম,—ঐ ওষুধের ঘ্রাণ ইভার নিদ্রিত অবস্থায় তার নিশ্বাসের সঙ্গে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কে এই হত্যা সংঘটনকারী,—তা তখনও জানতে পারিনি। রায়বাহাদুরকে সন্দেহ করলেও কোন প্রমাণ বের করতে পারলাম না।

শ্যামলীর ওপর অত্যাচার করবার অপরাধে রায়বাহাদুরকে যে রাত্রে গ্রেপ্তার করি,—সে রাত্রে শ্যামলীকে তার বাড়ীতে নিজে পৌঁছে দিতে যাই। শ্যামলীর বাড়ী থেকে ফেরবার পথে ইভার বাড়ীতে যাই। গুপ্তগৃহে প্রবেশ ক'রে দেখলাম,—একটুকরো সিগারেট মেঝেতে প'ড়ে আছে। সিগারেটের টুকরোটুকু সঙ্গে নিয়ে এলাম।

রায়বাহাদুর কখনও সিগারেট খান না,—চুরুট খান,—তা আমি জানতাম।

তারপর জার্মানীতে আমার নিজস্ব একটা টেলিগ্রাম করবার জন্যে সকাল বেলাতেই C. T. O.-তে গিয়েছিলাম। টেলিগ্রাম করে ফেরবার সময় দেখলাম Air Office থেকে ডাঃ বোস বেরুচ্ছে। Air Office-এ গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম—সেই রাত্রেই এগারোটার প্লেনে ডাঃ বোস Austria-তে যাবার জন্যে প্যাসেজ বুক করেছে। ডাঃ বোসের ওপর আমার সন্দেহ তখনই ঘনীভূত হ'ল। হঠাৎ গোপনে ডাঃ বোস পালিয়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল।

তারপর ডাঃ বোসের চেম্বারে গিয়ে উঠলাম,—কথাচ্ছলে রায়বাহাদুরের গ্রেপ্তারের কথা তাকে বললাম। ডাঃ বোস কিন্তু বিশেষ উৎসাহ দেখাল না, বা তার কলকাতা ছেড়ে যাবার কথাও কিছু উল্লেখ করল না। ডাঃ বোসের সিগারেট-কেস থেকে একটা সিগারেট উঠিযে নিয়ে ধরালাম। সেই ফাঁকে সিগারেটের 'ব্র্যাণ্ড' দেখে নিলাম। গুপ্তগৃহে ঐ ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের টুকরোই আমি পেয়েছি।

ডাঃ বোসই যে হত্যাকারী তা বুঝতে আমার আর দেরি হ'ল না।

ডাঃ বোস রাত্রির অন্ধকারে ঐ গুপ্তগৃহে প্রবেশ করে। ভারত ছেড়ে যাবার পূর্বে তার আবিষ্কারের তথ্যাদি যে নষ্ট ক'রে রেখে যাবে—তা আমি নিশ্চয় জানতাম।